আন্তর্জাতিক বেস্টসেলার

দ্য এ্যালকেমিস্ট

পাওলো কোয়েলহো

অনুবাদ : মাকসুদুজ্জামান খান

Find more books from
pdfboibd.blogspot.com

আমি খুব কমই এমন দিকনির্দেশনামূলক সরল বই দেখেছি যেমনটা পাওলো কোয়েলহোর দ্য এ্যালকেমিস্ট। খুব বিশ্বাস্যভাবে তরুণ এক স্বপ্নচারীর নিজেকে পাবার গল্প বলা হয় এখানে। দারুণ এক কাহিনী, সেইসাথে সব পাঠকের কাছে নির্দিষ্ট মেসেজ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে এখানে।

–জোসেফ গারজন, জতয়া 'র লেখক।

সান্তিয়াগো নামের এক ছেলে আমাদের নিয়ে যায় দারুণ এক অভিযানে।

–পল জিন্ডেল, পুলিৎজার পুরস্কার পাওয়া নাটক দ্য ইফেক্ট অন গামা রেজ অন ম্যান-ইন-দ্য মুন মেরিগোল্ডস এর নাট্যকার।

সান্তিয়াগো নামের এক ছেলের ব্যতিক্রমী এ্যাডভেঞ্চার এমন সব মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে যারা তাদের অভ্যন্তরীণ লক্ষ্যের দিকে পৌঁছতে চায়।

–শার্লট জলোটো, ইফ ইউ লিসেন এর লেখক।

পাওলো কোয়েলহো আপনার ল্যগুলো অর্জনের পথে সহায়ক হয়ে থাকবেন। নিজের চোখে লক্ষ্য অর্জনের জন্য, অন্য কারো চোখে নয়।

–লিন এ্যান্ড্রুস, দ্য মেডিসিন ওমেন ট্রিলজি 'র লেখক।

ছেলের নাম সান্তিয়াগো। শূণ্য গির্জার বুকে উঠে এল সে ভেড়ার পাল নিয়ে, আকাশ বেয়ে উঠে এল অন্ধকার। কত আগে ভেঙে পড়েছে ছাদ। বিশালবপু এক গাছ উঠেছে আজ সেখানে, যেখানে ছিল ধার্মিকদের আনাগোনা।

রাতটা কাটাবে এখানেই। সব ভেড়া ঢুকছে ভাঙা দরজা দিয়ে। ভাঙা ডালপালা জোগাড় করে সে, যেন পালটা এদিক সেদিক বেরিয়ে যেতে না পারে। এ তল্লাটে নেকড়ের নাম নিশানাও নেই। না থাকলে কী হবে, একবার কী এক নাম না জানা পশু হানা দিল। তারপর বেচারাকে পরদিন সারাটা সময় খরচ করতে হল সেটার খোজে।

পরনের ভারি জামাটা দিয়ে মেঝে ঝেড়ে নেয় সে। শুয়ে পড়ে সটান। এইমাত্র পড়ে শেষ করা বইটাই এখন বালিশের কাজ দিবে। নিজেকে শোনায়, এবার ভারি ভারি বই পড়া শুরু করতে হবে। পড়তে বেশি সময় লাগে, শুতে লাগে আরাম।

জেগে উঠে দেখে এখনো আঁধার কাটেনি। উপরে তাকালে দেখা যায় আধভাঙা ছাদ। আর দেখা যায় তারার দল।

আরো একটু ঘুমিয়ে নিতে চেয়েছিলাম আমি, ভাবে সে। সপ্তাখানেক আগে দেখা সেই স্বপ্নটা আবার এসেছে। আবারো ফুরিয়ে যাবার আগেই ঘুম হাপিস।

এখনো ঘুমিয়ে থাকা ভেড়াগুলোকে এবার জাগানোর পালা। হাতে তুলে নেয় লাঠি। যেন কোন অজানা শক্তি তাকে চালায়, চালায় ভেড়ার পালকেও, চালাচ্ছে বছর দুয়েক ধরে, চালাচ্ছে ঘাসের সন্ধানে, পানির খোজে।

'এরা আমার সাথে এত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে সময়ের ব্যাপারগুলোও ঠিক ঠিক বোঝে।' বিড়বিড় করে সে। একটু ভাবে। ব্যাপারটা ভিন্ন হতে পারে, হয়ত সেই তাদের সাথে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে আস্তে আস্তে।

কিন্তু কোন কোনটা কুঁড়ের বাদশা। উঠতেই চায় না। গুঁতিয়ে চলে ছেলেটা। আলতো করে। একে একে জাগিয়ে তোলে সবগুলোকে। নাম ধরে

ডাকে প্রত্যেককে। তার নিত্যদিনের বিশ্বাস, ওরা তার কথা বুঝতে পারে। তাই মাঝে মাঝে যখন বই থেকে কিছুটা পড়ে শোনায় ওগুলোকে, সাড়াও যেন পায়। কখনো কখনো আপনমনে বকে যায়, শোনায় রাখাল ছেলের একাকীত্বের কথা, শোনায় তাদের আনন্দের কথা। মাঝে মাঝে পেরিয়ে যাওয়া গ্রামগুলোয় কী দেখল সেসবও শোনায়।

কিন্তু গত কদিন ধরে তার কথা শুধু একটা ব্যাপার নিয়ে: মেয়েটার ব্যাপার। বণিকের মেয়ে। চারদিন পর সেখানে পৌঁছানোর কথা। গ্রামটায় গিয়েছিল মাত্র একবার। গেল বছরে। শুকনা পণ্যের বেসাতি করে বণিক লোকটা। তার দাবি, ভেড়াগুলোকে তার সামনেই মুড়িয়ে দিতে হবে, নাহলে ঠকল কিনা বোঝা যাবে না। কোন এক বন্ধুর কাছে দোকানের কথা শুনেছিল ছেলেটা, তারপর সেখানেই ভেড়ার পাল নিয়ে যাবার পালা।

'কিছু উল বিক্রি করা দরকার।' বণিককে বলে ছেলেটা।

দোকানের বিকিকিনি চলছে দেদার। তাকে অপেক্ষা করতে হবে বিকাল পর্যন্ত। কী আর করা, সে বসে পড়ে দোকানের সিড়ির এক ধাপে। ঝোলা থেকে বের করে একটা বই।

'রাখাল ছেলেরাও যে বই পড়তে পারে তাতো জানতাম না।' পিছন থেকে বলে উঠল মেয়েটা।

আন্দালুসিয়ার সাধারণ বেশভূষার এক মেয়ে। ঢেউ খেলানো চুল আছে তার। চোখদুটা দেখলে ঠিক ঠিক মুরিশ শাসকদের কথা মনে পড়ে যাবে।

'আসলে আমি বই থেকে যতটা শিখি তারচে বেশি শিখি ভেড়াগুলোর কাছ থেকে।'

দু ঘন্টা ধরে কথা বলল তারা। মেয়েটা জানায়, বণিক তার বাবা। জানায় গ্রামের জীবনের কথা, যেখানে হররোজ একই ভাবে কাটে।

রাখাল শোনায় আন্দালুসিয়ার দূরপ্রান্তের সব কথা। যেসব শহরে থেমেছে সেখানকার কথা। ভেড়াদের সাথে কথা বলারচে অন্যরকম লাগে তার কাছে।

'পড়তে শিখলে কী করে?'

'আর সবার মত,' চটপট জবাব দেয় ছেলেটা, 'স্কুলে।'

'আচ্ছা। পড়তে জানলে তুমি রাখাল ছেলে কেন?'

পাশ কাটিয়ে যাওয়া একটা জবাব ছুড়ে দেয় সে। জানে, মেয়েটা এসব বুঝবে না। তারপর শোনায় বসত থেকে বসতিতে যাবার গল্প; মেয়ের উজ্জ্বল

মুরিশ চোখের তারা বড় হয়, বড় বড় হয়ে যায় চোখদুটা ভয় আর বিস্ময়ে। বয়ে চলে সময়। ধীরে ধীরে ছেলেটা কেন যেন আশা করতে থাকে, দিনটা যেন না ফুরায়। যেন বাবা ব্যস্তসমস্ত হয়ে থাকে অহর্নিশি। যেন তিন দিনেও না ডাকে। এমন কোন অনুভূতি হচ্ছে যা আগে কখনো হয়নি: এক জায়গায় সারাটা জীবন কাটিয়ে দেয়ার ইচ্ছা। দিনগুলো আর আগের মত কাটবে না।

কিন্তু অবশেষে হাজির হয় দোকানি। চারটা ভেড়া মুড়িয়ে দিতে হবে। টাকাটা দিয়ে জানিয়ে দেয়, আসতে হবে আগামি বছর।

আর এখন সেখানে যেতে মাত্র চারদিন বাকি। তার অস্থির লাগছে, একটু একটু লজ্জাও হয়। কে জানে, মেয়েটা হয়ত এতদিনে ভুলেই গেছে। কত রাখালই যায় আসে, কতজন বিক্রি করে পশম তার ঠিক নেই।

'এতে কিছু এসে যায় না,' ভেড়াদের শোনায় সে, 'আমি অন্য সব গ্রামে অন্য মেয়েদের চিনি।'

কিন্তু হৃদয়ের গভীর থেকে জানে, কিছু না কিছু এসে যায়। জানে, নাবিক আর ভবঘুরে বিকিকিনি করা লোকজনের মত রাখালরাও কোন না কোন জায়গায় এমন কারো কথা মনে রাখে যে তাদের থিতু হতে বলে। মুখে না বলুক, মনকে দিয়ে বলায়।

দিনের শুরুতে রাখাল ছেলে সূর্যের দিকে চালিয়ে দেয় পালটাকে। তাদের কোন সিদ্ধান্ত নিতে হবে না, হয়ত এজন্যই আমার কাছে থাকতে ভালবাসে।

ভেড়াগুলোর একটাই চিন্তা। খাবার আর পানি। যতদিন ছেলেটা আন্দালুসিয়ার খাবারের উৎস চিনবে, ততদিন তারা চলবে তার সাথে। অবশ্যই, তাদের দিনরাত সবই একঘেয়ে। কাটে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তারা পড়তে জানে না। জানে না কী করে রাখালের কথা শুনতে হয়। তারা শুধু খাবার চেনে। বিনিময়ে দেয় পশম। মাঝে মাঝে মাংস।

আমি যদি আজ একটা বিকট দানব হয়ে একে একে তাদের মেরে ফেলতে থাকি, তাহলে বিচ্ছিন্ন হতে দেরি করবে না। বিশ্বাস করে আমাকে, তাই নিজের কল্পনা আর সাবধানতার উপর ভরসা করতে ভুলেই গেছে। কারণ পুষ্টির পথ দেখাই আমি।

ভাবনা থেকে অবাক হয়ে যায় ছেলেটা। হয়ত গির্জা, গির্জার ভিতরের দৈত্যাকার গাছটা ভূতুড়ে। এটাইতো তাকে এক স্বপ্ন দুবার দেখিয়েছে, রাগিয়ে তুলেছে তার পোষা জীবগুলোর বিরুদ্ধে। কাল রাতের খাবার থেকে বেঁচে

যাওয়া একটু মদ চেখে নেয় সে। শরীরের সাথে জ্যাকেটটা আটসাট থেকে ঢিল করে। তারপর খুলে ফেলে। আর একটু পর সূর্যটা যখন মাথার উপরে চলে আসবে তখন কড়া তাপে মাঠের ভিতর দিয়ে ভেড়া চালানো রীতিমত মুশকিল হয়ে যাবে। আজ এমন এক ভোর যখন পুরো স্পেন ঘুমে কাতর। গ্রীষ্মের ভোরতো, তাই। রাত নামা পর্যন্ত ভারি জামাটা বয়ে নিতে হল তাকে। ভারটা নিয়ে বিরক্ত হতে গিয়ে মনে পড়ে গেল, এটাই ভোরের শীত থেকে রক্ষা করে।

আমাদের বদলের জন্য প্রস্তুত হতে হবে, ভাবে সে, ভাবে, থাক ভারি জামার ওজন। মন্দ নয়।

ভারি জামার একটা উদ্দেশ্য আছে, যেমন আছে ছেলেটার। তার জীবনের লক্ষ্য পরিভ্রমণ, আর আন্দালুসিয়ায় দুটা বছর হেঁটে হেঁটে এলাকার সব শহর চলে এসেছে নখদর্পণে। এবার সে মেয়েটার কাছে ব্যাখ্যা করবে কী করে এক রাখাল ছেলে পড়তে জানে। বলবে, ষোল বছর পর্যন্ত পাঠশালায় ছিল। বাবা মা চেয়েছিল সে হবে যাজক, আর সাধারণ সে পরিবারে আসবে সম্মান। তারা শুধু খাবার পানির জন্য অনেক কষ্ট করত, ঠিক এ ভেড়াগুলোর মত।

সে লাতিন পড়েছে, পড়েছে স্প্যানিশ, আর ধর্মতত্ত্ব। কিন্তু একেবারে ছেলেবেলাতেই তার ইচ্ছা ছিল পৃথিবীকে জানার, মনে হয়েছে ঈশ্বর আর পাপ সম্পর্কে জানারচে এসব অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তারপর, এক বিকালে সে সাহস করে বাবাকে বলেই ফেলল, যাজক হতে চায় না। চায় ঘুরে ঘুরে পৃথিবীটাকে দেখতে।

'পৃথিবীর এখান সেখান থেকে কত মানুষ যে এ গ্রাম দিয়ে গেছে তার কোন ইয়ত্তা নেই, ছেলে।' বলেছিল বাবা। 'তারা নতুনের খোজে আসে এখানে, কিন্তু ছেড়ে যাবার সময় তারা যে মানুষ হয়ে এসেছিল তা হয়েই চলে যায়। দুর্গ দেখার আশায় ওঠে পাহাড়চূড়ায়, তার পরও, মনে করে অতীত বর্তমানেরচে ভাল। কারো লালচুল, কারো চামড়া কালো, কিন্তু সবাই আসলে এখানে থাকা মানুষের মতই। খুব বেশি হেরফের নেই।'

'কিন্তু যেসব শহরে তারা থাকে সেখানকার দুর্গগুলো দেখার ইচ্ছা ছিল আমার।'

'আর তারা যখন আমাদের এখানে আসে, বলে সারাটা জীবন এখানে কাটিয়ে যেতে পারলে মন্দ হত না। আমাদের মধ্যে যারা ভ্রমণ করে তারা রাখাল।'

'ভাল! তাহলে আমি রাখাল ছেলে হব!'

বাবা আর কোন কথা বলে না। পরদিন ছেলের হাতে ধরিয়ে দেয় স্প্যানিশ সোনার তিনটা মোহর।

'একদিন মাঠে পেয়েছিলাম এগুলো। চেয়েছিলাম তোমার কাজে লাগুক কোনদিন। এম্নি খরচ করে ফেলোনা। পশুর পাল কিনে নিও। মাঠ থেকে মাঠে ঘুরে বেড়াও। তারপর একদিন ঠিক ঠিক উপলব্ধি করবে যে তোমার দেশটাই সেরা। তোমার দেশের মেয়েরাই সবচে সুন্দর।'

তারপর বাবার আশীর্বাদ পড়ে ছেলের উপর। ছেলে দেখতে পায় বাবার চোখজোড়া। অবাক হয়ে দেখে, সেখানেও পৃথিবী ঘোরার উদ্দাম নেশা ঝিলিক খেলে যাচ্ছে। এখনো সে কামনা মুছে যায়নি। যুগ যুগ ধরে প্রোথিত বুকের ভিতর। স্বপ্ন বুকে নিয়ে বাবা দিনের পর দিন পান করার পানি খুজে বেড়ায়, যুঝে চলে একমুঠো খাবার জন্য, ঘুমায় বা নির্ঘুম রাত কাটায় একই জায়গায়।

দিগন্তরেখা লালচে হতে হতে এক সময় সূর্যকে নিয়ে এল। বাবার কথা মনে পড়ে যায় ছেলেটার, কেন যেন নিজেকে সুখি সুখি মনে হয়; অনেক দুর্গ দেখেছে সে, দেখেছে অনেক নারীর রূপ (কিন্তু কেউ আর কদিন পর যার সাথে দেখা হবে তার সাথে তুলনীয় নয়)। একটা ভারি জামা আছে তার, আছে বেচে দিয়ে বা বদলে নিয়ে নতুন একটা কেনার মত বই, আর আছে একদল ভেড়া। আর আছে হররোজ স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকার সাহস। আন্দালুসিয়ান মাঠে মাঠে এক সময় ক্লান্ত হয়ে যেতেই পারে সে, তখন প্রিয় ভেড়াগুলোকে বিক্রি করে দিয়ে পাল তুলে দিবে সাগরের বুকে। উত্তাল সমুদ্রের বুকে ভাসতে ভাসতে হরেক রকমের নগর দেখা হয়ে যাবে, দেখা পাবে অতুল রূপের সব রমণীর, দেখা পাবে বিচিত্র সব সুখের।

ধর্মশালায় আমি ঈশ্বরের দেখা পাব না, হয়ত পেতাম না কোনদিন, ভাবে সে উঠতে থাকা টকটকে লাল সূর্যের দিকে তাকিয়ে।

যখনি সম্ভব নতুন পথ ধরে সে, আগে কখনো ভাঙা গির্জায় যায়নি, যেমন যায়নি একই জায়গায় বারবার। পৃথিবী বিশাল, এখানে ক্লান্তির কোন স্থান নেই, তাকে শুধু ভেড়ার পাল চড়িয়ে যেতে হবে, তারপর তাকিয়ে দেখতে হবে অনির্বচনীয় সব দৃশ্য। সমস্যা হল, ভেড়াগুলো বুঝতেও পারে না তারা যে প্রতিদিন এক একটা নতুন পথে যাচ্ছে। দেখে না ঋতু বদলের খেলা। তাদের চিন্তা শুধু খাবার আর পানীয়, পানীয় আর খাবার।

হয়ত আমরা কাছাকাছি চলে এসেছি। মৃদু হাসির রেখা ছেলেটার ঠোঁটের কোণায়। বণিকের মেয়ের দেখা পাবার পর আর কারো কথা ভাবেনি সে। দুপুরের আগে তারিফায় পৌঁছে যাবে, সূর্যের দিকে তাকিয়ে বুঝে নেয়। সেখানে বইটা বদলে ভারি আরেকটা নিয়ে নেয়া যাবে। ভরে নেয়া যাবে মদের বোতলটা, দাড়ি কামিয়ে ছেটে নেয়া যাবে চুল। মেয়ের সাথে দেখা হবার আগে একটু সুন্দর হয়ে নিতে হবে তো। ভাবতেও পারে না যে আরো বড় কোন পাল নিয়ে অন্য কোন রাখাল এসে এর মধ্যেই মেয়েটার হাত ধরে বসেছে।

একটা স্বপ্নকে সত্যি করে দেখা, জীবনটাকে আরো একটু সাজিয়ে নেয়া, সূর্যের দিকে তাকিয়ে গতি আর একটু বাড়ানো, এসবই এখন মনের ভিতরে হানা দেয়।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। তারিফায় এক বয়েসি মহিলা আছে। সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে জানে।

তাকে বাসার পিছনে একটা কামরায় নিয়ে গেল মহিলা; রঙচঙে পর্দা দিয়ে ঘরটা শোবার ঘর থেকে আলাদা করা। ঘরটায় যিশুর পবিত্র হৃদয়ের ছবি, একটা টেবিল আর খান দুয়েক চেয়ার ছাড়া কিছু নেই।

মহিলা বসে পড়ে তাকেও বসতে বলে। তারপর হাতে তুলে নেয় হাত। নিরব প্রার্থনা করতে থাকে।

শুনে মনে হয় বেদুইনদের কোন প্রার্থনা। পথেঘাটে অনেক বেদুইনের সাথে পরিচয় হয়েছে তার; তারাও ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু কোন পশুর পাল নেই। লোকে বলে বেদুইনরা অন্যদের ঠকিয়ে টকিয়ে জীবন চালায়। তাদের সাথে নাকি দুষ্ট আত্মার খুব দহরম মহরম। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েকে তুলে নিয়ে গোপন জায়গায় নিয়ে যায়। তারপর জন্মের তরে দাস দাসী বানিয়ে রাখে। ছেলেবেলায় সে সর্বক্ষণ একটা আতঙ্কে থাকত। এই বুঝি বেদুইনরা এল, এই বুঝি তারা তাকে চিরদিনের জন্য নিয়ে গেল। সেই বাল্যকালের স্মৃতি ফিরে আসে মহিলার হাতে হাত রাখার সাথে সাথে।

কিন্তু এখানে তো যিশুর পবিত্র হৃদয় আছে, ভয়ের কী? ভাবে নিজেকে ফিরে পাবার চেষ্টা করতে করতে। হাত যেন না কাঁপে, তাহলে ভয়ের ব্যাপারটা বয়েসি মহিলা টের পেয়ে যাবে।

'বিচিত্র ব্যাপার,' ছেলের হাত থেকে চোখদুটা এক পলকের জন্য না সরিয়ে বলে মহিলা। তারপর একেবারে চুপ বনে যায়।

আস্তে আস্তে অস্থির হয়ে উঠছে ছেলেটা। মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে। মৃদু কাঁপছে হাতদুটা। টের পায় মহিলা। সাথে সাথে হাত সরিয়ে নেয় সান্তিয়াগো।

'আমি এখানে আমার হাত দেখাতে আসিনি তো!' এর মধ্যেই তার আসার জন্য আফসোস হচ্ছে। কেন খামোখা বিপদ ডেকে আনা বাবা! এখন ভালয় ভালয় পাওনা টাকাকড়ি বুঝিয়ে দিয়ে কেটে পড়তে পারলেই বাঁচে। স্বপ্নকে এত গুরুত্ব দিচ্ছে কেন?

'তুমি এসেছ, এসেছ স্বপ্ন বিষয়ে জানতে। আর স্বপ্ন কী তা জান নাকি? স্বপ্ন হল ঈশ্বরের ভাষা। যখন তিনি আমাদের ভাষায় কথা বলেন, তখন আমি সেটা অনুবাদ করে দিতে পারি। কিন্তু যখন কথাটা হয় আত্মার ভাষায়, তখন শুধু তুমিই ধরতে পারবে প্রকৃত অর্থ। যাই হোক, আমি উপদেশের জন্য তোমার কাছ থেকে কিছু নিব।'

আবার ছলচাতুরি, ভাবে ছেলেটা। কিন্তু একটা সুযোগ নেয়া যেতে পারে। রাখাল ছেলে সব সময় নেকড়ের ঝুকি নেয়, ঝুকি নেয় খরার, আর এসব করলেই জীবনটা হয়ে ওঠে দারুণ।

'আমি একই স্বপ্ন দুবার দেখেছি। ভেড়াগুলোকে নিয়ে একটা মাঠে ছিলাম, এমন সময় এক ছেলে কোত্থেকে যেন এসে সেগুলোর সাথে খেলা শুরু করে। এমনধারা মানুষ আমার মোটেও ভাল্লাগেনা। কারণ আছে, ভেড়াগুলো নতুন কাউকে দেখলে ভড়কে যায়। কিন্তু শিশুরা কী করে যেন তাদের ভয় না পাইয়ে সুন্দর খেলে যায়। কে জানে কীভাবে করে কাজটা। মানুষের বয়সটা কেমন করে পশুরা আন্দাজ করে তাও জানি না।'

'স্বপ্নটার ব্যাপারে আরো কিছু বল দেখি। চটজলদি রান্নাবাড়ার কাজে যেতে হবে। বোঝাই যায়, তোমার কাছে খুব বেশি পয়সা নেই, যখন খুব বেশি পয়সা নেই, তখন আমার হাতে খুব বেশি সময়ও নেই।'

'বাচ্চাটা আমার ভেড়াগুলোর সাথে বেশ কিছুক্ষণ খেলল।' সামান্য হতাশ হয়ে বলতে থাকে ছেলেটা, 'তারপর হঠাৎ সে আমাকে জড়িয়ে ধরে। ধা করে নিয়ে যায় মিশরের পিরামিডে।'

ইচ্ছা করেই থামে সান্তিয়াগো। বোঝার চেষ্টা করে মহিলা মিশরিয় পিরামিডের ব্যাপারে কিছু জানে কিনা। কিন্তু কোন জবাব নেই মহিলার মুখে।

'তারপর, মিশরিয় পিরামিডে,'– ধীরলয়ে বলে চলে সে, যেন প্রতিটা বর্ণ ঠিক ঠিক ধরতে পারে মহিলা– 'নিয়ে গিয়ে মেয়েটা বলে, *এখানে এলে পাবে এক লুকানো জিনিস। গুপ্তধন।* তারপর যখনি সে ঠিক জায়গাটা দেখাতে চায় তখনি ঘুম ভেঙে যায়। দু বারই একভাবে জেগে গেছি আমি।'

মহিলা কিছুক্ষণ কোন কথা বলে না। তারপর আবার সান্তিয়াগোর হাত হাতে তুলে নেয়ার পালা। আবার সেগুলো খুটিয়ে দেখার পালা।

'এখন আমি তোমার কাছ থেকে সোনা-রূপা কিছুই চাই না। কিন্তু গুপ্তধন পেলে দশভাগের একভাগ চাই।'

ঝলমলিয়ে হেসে ওঠে ছেলেটা। যাক, গুপ্তধনের স্বপ্নের ব্যাখা চাইতে গিয়ে যে টাকাটুকু জলে যেত সেটা আর হারাল না।

'ঠিক আছে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিন।'

'আগে শপথ কর। শপথ কর যে আমি যা বলব সে অনুসারে গুপ্তধন পেলে আমাকে দশভাগের একভাগ দিয়ে দিবে।'

শপথ করে সান্তিয়াগো। মহিলা আবার যিশুর হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে শপথ করতে বলে।

'স্বপ্নটা পৃথিবীর ভাষায় এসেছে, ব্যাখ্যাতো আমি করতে পারি হরহামেশা, কিন্তু অর্থ বের করা একটু জটিল। তাই মনে হচ্ছে আমি তোমার পাওনা থেকে কিছু প্রাপ্য।

'আর এ হল আমার অর্থ: তোমাকে অবশ্যই মিশরের পিরামিডে যেতে হবে। আমি কখনো তাদের কথা শুনিনি, তবে কোন শিশু যদি তোমাকে সেসব দেখিয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই তেমন কিছু আছে। সেখানে সম্পদ পাবে। ধনী বনে যাবে তুমি।'

এবার সান্তিয়াগোর অবাক হবার পালা। এরপর বিরক্ত। এ কথা জানার জন্যতো বয়েসি মহিলার কাছে আসার কোন দরকার নেই। তার পর মনে পড়ে যায়, ভাগ্য ভাল, কোন টাকাকড়ি দিতে হচ্ছে না।

'আমি এসবের জন্য সময় নষ্ট করব বলে মনে হয় না।'

'আগেই বলেছি, তোমার স্বপ্নটা জটিল। এ হল জীবনের সাধারণ ব্যাপার যা ধীরে ধীরে অসাধারণ হয়ে ওঠে। শুধু জ্ঞানীরাই মূল অর্থ ধরতে পারে। কিন্তু আমি জ্ঞানী নই। আর জ্ঞানী নই বলে আর সব জিনিস শিখতে হয়, শিখতে হয় হাতের তালু পড়া।'

'তাহলে কী করে মিশরে যাব?'

'আমার কাজ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা। কী করে বাস্তব করতে হয় সে সম্পর্কে আমি ক অক্ষর গো-মাংস। তাইতো আমাকে মেয়ের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়।'

'আর যদি কখনো মিশরে না যাই?'

'তখন আমার আর কষ্টের ফল পাওয়া হবে না। এর আগেও এমন হয়েছে।'

এরপর মহিলা তাকে চলে যেতে বলে। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। আর নয়।

ছেলেটার আশাভঙ্গ হয়। সে আর কখনো স্বপ্নে বিশ্বাস করবে না। কখনো না। অনেক ব্যাপারে ভাবতে হয় তাকে, অনেক বিষয় মাথায় রেখে চলতে হয়।

বাজারে গিয়ে কিছু খাবার দাবার কিনে খেয়ে নেয় প্রথমে। তারপর পুরনো বইটা বিকিয়ে দিয়ে আরো একটু মোটা দেখে বই কিনে নেয়। তারপর চত্বরে বসে নতুন মদ থেকে একটু চেখে দেখে। ভ্যাপসা গরমের দিনে সামান্য মদ্যপান মন্দ লাগে না।

শহরে ঢোকার পথে ভেড়াগুলোকে কোন এক বন্ধুর আস্তাবলে রেখে এসেছে সে। ভ্রমণের এই এক মজা। দেশ থেকে দেশ দেশান্তরে যাও, নতুন নতুন বন্ধু বানাও, আবার তাদের সাথে বেশি সময় কাটিয়ে বিরক্ত হবার সুযোগও নেই হাতে। মানুষ যখন নিত্যদিন একই মুখ দেখতে থাকে ধর্মশালায় থাকার দিনগুলোর মত, তখন সেই অবয়বগুলো জীবনের অংশ হয়ে যায়। তখন মানুষের মনে তাদের একটু বদলে দেখার ইচ্ছা হয়। যখন বদলে দেখা যায় না, কেন যেন রাগে ফেটে পড়ে কেউ কেউ। সবারই যেন একটা গৎবাধা নিয়ম আছে, সবাই যেন চায় অন্যের জীবনের চালচলন তার ইচ্ছামত বা তার আদর্শমত হোক। শুধু নিজের জীবনটার ব্যাপারে এসব থলি শূণ্য।

সূর্য আরো একটু নেমে যাবার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সান্তিয়াগো। তখন পাল নিয়ে মাঠের দিকে রওনা হওয়া যাবে। আর মাত্র দিন তিনেক। তার পরই মেয়ের সাথে দেখা। সেই মেয়েটার সাথে দেখা।

কিনে আনা বইটা পড়তে শুরু করে সে। প্রথম পাতাতেই কবর দেয়ার অনুষ্ঠানের বর্ননা। সেখানকার মানুষগুলোর নামও কেমন বিদঘুটে। উচ্চারণ করতে দাত ভেঙে যায়। যদি কখনো বই লিখি, ভাবে সে, তাহলে এক সময়ে একজনের বেশি মানুষ হাজির করব না যাতে লোকে নাম মনে করতে গিয়ে ভিড়মি না খায়।

পড়ার দিকে অবশেষে মন দিতে পেরে ভাল লাগে তার। বইটা মন্দ না। শুধু কবর দেয়ার দিনটা কেমন যেন মন খারাপ করে দেয়। রীতিমত তুষারপাত হচ্ছিল তখন। শিতল অনুভূতি এসে যায় মনে।

পড়া চলছে, এমন সময় বয়েসি এক লোক ধপ বসে পড়ে তার পাশে। কথা চালানোর জন্য যেন উসখুস করছে লোকটা।

'কী করছে এরা, এ্যা?' চত্বরের দিকে আঙুল তাক করে প্রশ্ন ছুড়ে দেয় লোকটা।

'কাজ।' এমন শুষ্কভাবে জবাব দেয় সান্তিয়াগো যেন লোকটা বুঝে যায় সে কথা চালাচালিতে খুব একটা আগ্রহী নয়।

আসলে তার মনে এখন বণিকের মেয়ের সামনে ভেড়া মুড়িয়ে দেয়ার কল্পনা। মেয়েটা তাহলে বুঝবে। বুঝবে এ যে সে ছেলে নয়। কঠিন কঠিন কাজ করে ফেলতে পারে সহজেই। সে অনেকবার ভেবে ফেলেছে কথাগুলো। আস্তে আস্তে মেয়েকে বলবে, কী করে ভেড়া ন্যাড়া করতে হয়। শুরু করতে হবে পিছনদিক থেকে। মুড়িয়ে নেয়ার সময় কিছু গালগল্প চালাতে হবে, কী কথা বলা যায় সেসব ভেবে ভেবেও হয়রান সে। মেয়েটা বইয়ের গল্প আর তার বলা গল্পের ফারাক বুঝতে পারবে না মোটেও। পড়তেই জানে না।

এদিকে এখনো বুড়ো লোকটা কথা চালানোর জন্য অস্থির হয়ে আছে। আগেই বলেছে, একেতো ক্লান্ত তার উপর তৃষ্ণার্ত। সান্তিয়াগোর বোতল থেকে এক চুমুক মিলবে নাকি? তার এদিকে ছেড়ে দে মা কেদে বাচি অবস্থা। বোতল এগিয়ে দেয়। তাও সে তাকে ছেড়ে যাক।

কিন্তু বয়েসি লোকটার একটাই ইচ্ছা। আরো একটু কথা বলা। কী বই পড়ছে সে? এবার আর পারে না সান্তিয়াগো। অন্য কোন বেঞ্চিতে গিয়ে বসবে কিনা ভাবছে। কিন্তু বাবা বলেছিল, বয়স্কদের সাথে সম্মান দেখিয়ে আচরণ করতে হয়। ফলে বইটা এগিয়ে দেয় তার দিকে– দুটা উদ্দেশ্যে: প্রথমত, সে নিজেও ছাই জানে না নামের উচ্চারণটা কী হবে; দ্বিতীয়ত বয়েসি লোকটা যদি পড়তে না জানে তাহলে সে লজ্জা পেয়ে অন্য কোন বেঞ্চে গিয়ে বসবে।

'হুম...' উল্টেপাল্টে এমনভাবে বইয়ের দিকে তাকায় বুড়ো, যেন বিচিত্র কিছু দেখছে, 'বইটা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু বিরক্তিকর।'

এবার সান্তিয়াগোর অবাক হবার পালা। লোকটা শুধু পড়তে জানে না, আগেভাগেই সেটা পড়ে রেখেছে। আর তার কথামত সত্যি সত্যি যদি এ বই বিরক্তিকর হয়ে থাকে তো এখনো বদলে নেয়ার সময় আছে।

'এ বইতে যা আছে প্রায় একই কথা থাকে দুনিয়ার আর সব বইতে,' কথা বলার বিষয় পেয়ে গেছে বয়েসি লোকটা, 'এখানে কী ব্যাখ্যা করা আছে জান? ব্যাখ্যা করা আছে যে মানুষ তার আসল গন্তব্য নিজে নিজে ঠিক করে নিতে পারে না। আর শেষে লেখা আছে যে সবাই সর্বশান্ত হয়ে ধরে নেয় পৃথিবী আসলে বিশাল এক ফক্কিকার।'

'তাহলে পৃথিবীর সবচে বড় মিথ্যাটা কী?' অবাক না হয়ে পারে না ছেলেটা।

'তা হল: আমাদের একেকজনের জীবনের এক একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে আমাদের আশপাশে যা হচ্ছে তার উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। তখন জীবনের নিয়ন্ত্রণ নেয় ভাগ্য। এটাই দুনিয়ার সবচে বড় মিথ্যা।'

'কিন্তু এমন কিছু আমার ক্ষেত্রে হয়নি। তারা আমাকে ধরেবেধে যাজক বানাতে চেয়েছিল। আমি চেয়েছিলাম রাখাল হতে। তাই হয়েছি।'

'ভাল। দারুণ। কারণ তুমি সত্যি সত্যি ভ্রমণ করতে ভালবাস।'

'আমি কী ভাবছি তার নাড়িনক্ষত্র দেখি জানে লোকটা!' ফিসফিসিয়ে নিজেকে বলে সান্তিয়াগো। এদিকে লোকটা পাতার পর পাতায় চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে। এখন আর তার দিকে কোন মনোযোগ নেই। এতক্ষণে তার নজরে পড়ল, লোকটার বেশভূষা বিচিত্র। দেখে মনে হয় আরব। এ তল্লাটে আরবদের দেখা পাওয়া দুরাশা। তারিফা থেকে আফ্রিকা যেতে মাত্র কয়েক ঘন্টা সময় লাগে। শুধু সরু জলাশয় পেরিয়ে যেতে হবে জাহাজে করে। নৌকা হলেও চলে। ও, আরবরাতো এ শহরে মাঝেমধ্যেই আসে। তারপর বিকিকিনি করে। অবাক করা প্রার্থনা করে দৈনিক কয়েকবার।

'কোত্থেকে এসেছেন আপনি?'

'অনেক জায়গা থেকে।'

'কেউ অনেক জায়গা থেকে আসতে পারে না। আমি রাখাল, অনেক অঞ্চলে গিয়েছি, কিন্তু এসেছি মাত্র একটা এলাকা থেকে। আদ্যিকালের দুর্গের পাশের শহর। সেখানেই জন্ম।'

'আচ্ছা, তাহলে বলতে হয় আমি জন্মেছিলাম সালেমে।'

কে জানে সালেম কোথায়। কিন্তু প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। যদি ছোট চোখে দেখে বৃদ্ধ লোকটা। চত্বরে ভিড় করা হরেক ধরনের মানুষের দিকে তাকায় সে। সব আসছে যাচ্ছে। যাচ্ছে আসছে। মহাব্যস্ত।

'মানে, সালেম জায়গাটা কেমন?' কোন সূত্র পাবার আশায় আন্দাজে ঢিল ছোড়ে সান্তিয়াগো।

'সব সময় যেমন ছিল তেমনি।'

কোন সূত্র পাওয়া গেল না। এটুকু সে জানে, সালেম আন্দালুসিয়ার কোন এলাকা নয়। থাকলে এতদিনে যাক না যাক, শুনতে পেত সে এলাকার কথা।

'সালেমে কী করেন আপনি?'

'আমি সালেমে কী করি?' এবার সত্যি হেসে উঠল লোকটা। 'আসলে... আমি সালেমের রাজা!'

মানুষ কত বিচিত্র কথাই না বলে! মাঝে মাঝে তাই মনে হয়, ভেড়াদের সাথে থাকাটা মোটেও মন্দ নয়। তারা কিস্যু বলতে পারে না। আর সাথে একটা বই হলে– তোফা। সেখানে আছে বিচিত্র সব কাহিনী। আর সবখানে যাওয়া, সব পরিবেশ বুঝে নেয়া কঠিন; সহজ হল, সাথে একটা বই রাখা। কিন্তু মুশকিল হয় লোকজনের সাথে কথা বলার সময়, মাঝে মাঝে ধুপ করে মানুষ এমন সব কথা বলে বসবে যে কথার পিঠে কোন কথা খুজে পাবে না তুমি।

'আমার নাম মেলসিজেদেক,' অবশেষে বলল লোকটা, 'কতগুলো ভেড়া আছে তোমার?'

'যথেষ্ট।' ঠান্ডা জবাব দেয় সান্তিয়াগো। লোকটা তার সম্পর্কে আরো জানার চেষ্টা করছে। বোঝা যায়।

'আচ্ছা! তাহলে আমাদের একটা সমস্যা দেখা দিল যে। তোমার যদি সত্যি সত্যি যথেষ্ট পরিমাণে ভেড়া থেকে থাকে তাহলে আমি তোমাকে কোনভাবেই সহায়তা করতে পারব না।'

এবার আরো বিরক্ত হচ্ছে ছেলেটা। সে সাহায্য চাইল কোন সময়? বুড়ো লোকটাইতো আগ বাড়িয়ে তার কাছ থেকে একটু মদ খেতে চেয়েছিল। গায়ে পড়ে কথা শুরু করাটাও তারই কাজ।

'বইটা দেন দেখি। আমার এখন উঠতে হবে। অনেক কাজ বাকি। ভেড়াগুলো একত্র করে রওনা দিতে হবে।'

'তোমার ভেড়াগুলোর দশভাগের একভাগ আমাকে দাও,' বলল বয়েসি লোকটা, 'তাহলে আমি তোমাকে গুপ্তধন পাবার পথের কথা বলতে পারি।'

স্বপ্নের ব্যাপারটা মনে পড়তেই বাকি কথাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বয়েসি মহিলা তার কাছ থেকে কিছু নেয়নি, কিন্তু এ বুড়ো লোকটা– কে জানে মহিলার স্বামী কিনা– এমন কিছু চাচ্ছে যা দিয়ে মহিলার টাকাও পুষিয়ে যাবে, আবার বাড়তি কিছু পাওয়া যাবে। মনে হয় বুড়ো লোকটা বেদুইন।

কিন্তু সে কিছু বলার আগেই বয়স্ক লোকটা উবু হয়ে চত্বরের ধুলার গায়ে সান্তিয়াগোর লাঠি দিয়ে কী যেন লেখা শুরু করল। তার বুক থেকে উজ্জ্বল কীসের আলো যেন বিচ্ছুরিত হয়। এক পলকের জন্য রীতিমত অন্ধ বনে যায় ছেলেটা। মুহূর্তের মধ্যে, এ বয়েসি লোকদের জন্য যা বেমানান গতি, সে গতিতে বুক ঢেকে ফেলল লোকটা। এবার দৃষ্টি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মাটিতে লেখাগুলো পড়তে পারছে সে।

সেখানে, এক খুদে শহরের ক্ষুদ্রতর চত্বরে জমে ওঠা ধুলার উপর ছেলেটা দেখতে পায় তার বাবার নাম, দেখে মায়ের নাম, যে ধর্মশালায় পড়েছিল সেটার নাম। দেখে বণিকের মেয়েটার নাম– যে নাম জানে না সে। দেখে আরো অনেক শব্দ, যেগুলো কখনো বলেনি কাউকে।

'আমি সালেমের রাজা।' বলেছিল বয়েসি লোকটা।

'রাজা কেন সামান্য এক রাখালছেলের সাথে কথা বলবে?'

'বেশ কিছু কারণে। সবচে বড় কারণ, তোমার লক্ষ্য খুজে বের করতে পেরেছ তুমি।'

ছেলেটা জানে না কোন মানুষের লক্ষ্য জিনিসটা কী।

'লক্ষ্য হল সে বিষয় যা কেউ সব সময় চায়। কম বয়েসি থাকতে সবাই তার লক্ষ্য চিনে যায়।

'সেটা পরিচিত হবার পর স্পষ্ট হয়, সম্ভব। সব সম্ভব। স্বপ্নে আর ভয় পায় না। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে অদ্ভুত এক শক্তি তাদের বিশ্বাস করাতে শুরু করে যে লক্ষ্যে পৌছানো অসম্ভব।'

সব অর্থ ছাই বুঝছে রাখাল ছেলে। তার শুধু একটাই চিন্তা। সেই রহস্যময় শক্তির ব্যাপারটুকু বুঝে নিতে হবে। শুনলে চোখ বড় বড় করে ফেলবে বণিকের মেয়ে।

'এও এক শক্তি। শক্তিটা না-বোধক। কিন্তু আসলে সেটাই তোমাকে লক্ষ্য অর্জনের পথ দেখাবে। তোমার আত্মা, তোমার ইচ্ছাকে প্রস্তুত করে এটা, শিখায় এ গ্রহের বড় সত্যিটা: যেই হও না কেন তুমি, যাই কর না কেন, যখন সত্যি সত্যি মন থেকে চাইবে কিছু, চাও এ কারণে যে বিশ্বব্রহ্মান্ডের ভিতর থেকেই ইচ্ছা জেগে ওঠে তোমার ভিতরে। পৃথিবীর বুকে এটাই তোমার অভিযান।'

'এমনকি যদি আমি ভ্রমণ করতে চাই, যদি কাপড়-সুতার বণিকের মেয়েকে বিয়ে করতে চাই, সেটাও লক্ষ্য হতে পারে?'

'আবার কোন গুপ্তধনের পিছু ধাওয়াও হতে পারে। বিশ্বের আত্মা শুদ্ধ হয় কী করে জান? মানুষের আনন্দে। আবার নিরানন্দ, হিংসা, ক্রোধ দিয়েও হয়। লক্ষ্য বুঝতে পারাই মানুষের জীবনের আসল উদ্দেশ্য। সব জিনিসই এক।

'আর যখন তুমি কিছু যাও, পুরো সৃষ্টিজগতে সাড়া পড়ে যায়। ফিসফাস করে তোমাকে সাহায্য করার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়ে সবকিছু।'

নিরবতা নেমে আসে ছোট শহরের চত্বরে। আবার কথা বলে ওঠে বয়েসি লোকটা।

'তুমি ভেড়ার পাল চালাও কেন?'

'ভ্রমণ করতে চাই, তাই।'

লোকটা এক রুটিওয়ালার দিকে আঙুল তোলে। লোকটা দাঁড়িয়ে আছে নিজের দরজার সামনে। 'বাচ্চা থাকতে ঐ লোকটাও পরিভ্রমণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রথমে চিন্তা করল একটা রুটির কারখানা কিনে কিছু পয়সাকড়ি জমিয়ে নিবে। বুড়ো হলে মাসখানেক কাটিয়ে আসবে আফ্রিকায়। লোকটা বুঝতেই পারল না যে আসলে মানুষ যার স্বপ্ন দেখে তা করতে পারে যে কোন সময়ে।'

'লোকটার তো রাখালছেলে হবার কথা তাহলে।'

'কথাটা কিন্তু তার বিবেচনায় ছিল।' বলল বয়েসি লোক, 'কিন্তু রুটিওয়ালারা, রুটির কারখানার মালিকরা রাখালেরচে বেশি সম্মানিত। তাদের আছে ঘর, আর রাখালের আছে খোলা মাঠ। বাবা মা মেয়েকে রাখালের সাথে বিয়ে দিতে চায় না, দিতে চায় রুটি কারখানার মালিকের সাথে।'

হৃদয়ের কোথায় যেন একটু ধাক্কা লাগে সান্তিয়াগোর। এক বণিকের মেয়ে আছে কাছাকাছি কোথাও। সেখানে যে রুটিওয়ালাও আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বলে যাচ্ছে বুড়ো, 'অবশেষে মানুষ রুটির কারখানার মালিক আর রাখালদের ব্যাপারে কী ভাবে সেটাই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল। গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল জীবনের লক্ষ্যেরচে।'

লোকটার কথা থেমে যায় হঠাৎ করে। সে মন দেয় বইয়ের পাতায়। পড়তে থাকে একমনে। তারপর আচমকা বাধা দেয় সান্তিয়াগো।

'আমাকে এসব বলছেন কেন?'

'কারণ তুমি তোমার উদ্দেশ্য খুজে বের করার চেষ্টা করছ। আর যে পর্যায়ে আছ তাতে যে কোন মুহূর্তে ইচ্ছাটা ত্যাগ করতে পার।'

'আর ঠিক এ মুহূর্তে দৃশ্যে আপনি হাজির হন?'

'না। সবসময় এভাবে হাজির হই না। কিন্তু কোন না কোন গড়ন নিয়ে হাজির হই বৈকি। কখনো সামাধান আকারে, কখনো ভাল কোন ধারণা হিসাবে। আবার কখনো খুব গুরুত্বপূর্ণ পল অনুপলে ঘটনাগুলোকে সহজে ঘটিয়ে দেই। আরো নানা ঘটনা ঘটাই, শুধু লোকে বুঝতে পারে না যে আমিই এসব করছি।'

লোকটা বুঝিয়ে বলে, গত সপ্তাহের আগের সপ্তায় খনি শ্রমিকের সামনে তাকে পাথর হয়ে আসতে হয়েছিল। তার গত পাঁচ বছরের শ্রম শুধু রত্নের জন্য। এমারাল্ড পাথর বের করবে সে পাথর থেকে। সেজন্য লাখ লাখ পাথর ভেঙেছে সে নদীর নিচ থেকে তুলে এনে, পাহাড়ের গা থেকে খুলে এনে।

আর মাত্র একটা, একটা পাথর ভাঙলেই সে এমারাল্ড পেয়ে যেত। লোকটা যখন লক্ষ্যের জন্য সব ছেড়ে দিয়েছে, হাজির হতে হল বৃদ্ধকে। পাথর হয়ে গেল সে। পাথরটা গড়িয়ে এল তার পায়ের কাছে।

পাঁচ বছরের রাগ সামলাতে না পেরে সে পাথরটাকে ছুড়ে দেয় দূরে। এত জোরে ছোড়ে সে যে পাথর ভেঙে যায়। সেটার ভিতরেই ছিল পৃথিবীর সবচে সুন্দর এমারাল্ডটা।

'মানুষ তার জীবনের শুরুতে জানতে শুরু করে জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে,' কেমন যেন তিক্ত শোনায় বয়েসি লোকটার কণ্ঠ, 'আর সে কারণেই হয়ত চটজলদি হালও ছেড়ে দেয়। এই হল ঘটনা।'

লোকটাকে ছেলেটা তার লুকানো সম্পদের ব্যাপারে বলে।

'বহতা ধারার আঘাতে জেগে ওঠে সম্পদ, আবার ডুবে যায় সেই একই ধারার নিচে,' বলছে লোকটা, 'তুমি যদি নিজের সম্পদ সম্পর্কে জানতে চাও, ভেড়া থেকে দশভাগের একভাগ দিয়ে দিতে হবে।'

'সম্পদের এক দশমাংশ হলে কেমন হয়?'

হতাশ দেখায় লোকটাকে।

'তুমি যদি যা হাতে নেই তা নিয়েই ওয়াদা দিতে থাক, সেটা পাবার আশাই চলে যাবে।'

এ জানালাটা দিয়ে লোকে আফ্রিকার টিকেট কাটে। আর সে জানে, মিশর আফ্রিকায়।

'কোন সাহায্য করতে পারি?' জানালার পিছনে বসা লোকটা জিজ্ঞেস করে।

'হয়ত কাল,' সরে যেতে যেতে বলে ছেলেটা। একটা ভেড়া বিক্রি করলেই সে অপর প্রান্তে পৌছে যাবার রাহা খরচ পেয়ে যাবে। কিন্তু ভাবনাটা কেমন যেন ভয় ধরিয়ে দেয়।

'আরেক স্বপ্নবিলাসী,' সাথের লোকটাকে শোনায় টিকিটওয়ালা, 'যাবার মত টাকা নেই, ইচ্ছা আছে।'

টিকেটের জানালায় বসে থাকার সময় তার মনে হঠাৎ দেখা দেয় ভেড়াগুলোর চিন্তা। আর সে চিন্তা কী করে যেন অস্থির করে তোলে। ফিরে যেতে ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা করে আবার রাখাল ছেলে হয়ে যেতে। দু বছরে রাখালদের সব কাজ শিখে ফেলেছে: কী করে ভেড়ার পাল চালাতে হয়, গর্ভবতী ভেড়াগুলোর যত্ন নিতে হয় কী করে, কী করে বাঁচাতে হয় শিকারী পশুর হাত থেকে। আন্দালুসিয়ার সব মাঠ, সব পানির ধারা তার পরিচিত। এবং সে তার প্রত্যেক ভেড়ার ন্যায্য মূল্য কতটা তাও জানে।

যত ঘুরপথে সম্ভব আস্তাবলের দিকে পা বাড়ায় সে। যাবার পথে শহরের বাইরে থাকা বিশাল দুর্গটার পাশ দিয়ে উপরে ওঠে। দেখতে পায় জলরাশি। জলরাশি ছাড়িয়ে দেখতে পায় আফ্রিকার উপকূল। সেখান থেকেই মুররা এসেছিল স্পেনে। জয় করেছিল স্পেন।

এখান থেকে পুরো নগরীও দেখা যায়। দেখা যায় বুড়ো লোকটার সাথে বসে থাকার জায়গা। এ শহরে এসেছিল শুধু এক মহিলাকে পাবার জন্য যে

স্বপ্নের তাবির জানে। মহিলা বা বয়েসি লোক– কেউ তার রাখাল পরিচয়ে খুব বেশি সন্তুষ্ট হয়নি। এ মানুষগুলো একা। তারা রাখাল ছেলের ভেড়ার পাল নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর ব্যাপারটা বোঝে না। সে তার পালের প্রত্যেকটার নাড়িনক্ষত্র চেনে। জানে কোনটা কুড়ের বাদশা, কোনটা দুমাস পর বাচ্চা বিয়াবে, কোনটা ছটফটে। এ প্রাণিগুলোকে ছেড়ে গেলে ভুগবে বেচারারা।

শা শা করে বেড়ে যায় বাতাসের গতি। এ বাতাসকে লোকে ডানে লিভাটার নামে। কারণ মুররা লিভ্যান্ট থেকে এসেছিল।

মুহূর্তে বেড়ে যায় বাতাসের বেগ। আমি এখন সম্পদ আর ভেড়ার পালের মাঝামাঝি অবস্থান করছি। এখন বেছে নিতে হবে। বেছে নিতে হবে চিরাচরিত অভ্যাসের একটা বিষয় আর চাওয়ার একটা বিষয়ের মধ্য থেকে যে কোনটাকে।

বণিকের মেয়েও আছে, কিন্তু তার গুরুত্ব ভেড়ার পালেরচে বেশি নয়। কারণ মেয়েটা তার উপর নির্ভর করে না। কে জানে, তার কথা মনে নাও থাকতে পারে। কবে সান্তিয়াগো তার কাছে যাবে তাতে কিছু এসে যায় না মেয়েরঃ তার কাছে সব দিন সমান, আর যখন সব দিন কারো কাছে সমান হয়ে যায় তখন মানুষ তার জীবনে হররোজ ওঠা সূর্যের সাথে আসা নতুন আর ভাল ব্যাপারগুলোকে চিনতে পারে না।

আমি বাবাকে ছেড়ে এসেছি, ছেড়ে এসেছি মা, আমার শহর, আমার প্রিয় দুর্গটাকে। অনেক পিছনে। তারা এখন আমাকে ছাড়াই অভ্যস্ত। যেভাবে ভেড়াগুলোও আস্তে আস্তে মানিয়ে নিবে। আমার অভাব বোধ করবে না।

এখান থেকে চত্বর দেখা যায়। দেখছে সে একমনে। লোকজন আসছে যাচ্ছে রুটিওয়ালার দোকানে। দুজন তরুণ তরুণী বসে আছে সেই বেঞ্চিটায়, যেখানে সে আর বুড়ো লোকটা বসেছিল।

'ঐ রুটিওয়ালা...' নিজের কানেই কী যেন শোনাতে চায় সে। কথাটা আর শেষ হয় না। এখনো লেভেন্টারের শক্তি বাড়ছে মদমত্ত হাতির মত। মুখে এসে ঝাপ্টা মারছে। এ বাতাস নিয়ে এসেছে মুরদের। কথা সত্যি। একই সাথে সব সময় নিয়ে আসে মরুভূমির দমকা হাওয়া। নিয়ে আসে পর্দাঘেরা মেয়েদের কথা। সেসব মানুষের ঘাম আর স্বপ্ন নিয়ে আসে এ বাতাস, যারা এক সময় অজানাকে জানার জন্য পাড়ি জমিয়েছিল, পাড়ি জমিয়েছিল স্বর্ণের জন্য, অভিযানের আশায়, পিরামিডের জন্য।

বাতাসের স্বাধীনতা কেমন যেন হিংসা বয়ে আনে। আহা, তারও একই ধরনের স্বাধীনতা থাকতে পারত। তাকে আকড়ে ধরার মত কেউ নেই এক সে ছাড়া। ঐ ভেড়ার পাল, বণিকের ঐ মেয়েটা, আন্দালুসিয়ার ধূ ধূ প্রান্তর শুধুই তার লক্ষ্যের পথে কিছু পদক্ষেপ।

পরদিন। দুপুরে আবার দেখা বুড়ো লোকটার সাথে। সাথে করে ছটা ভেড়া নিয়ে এসেছে।

'অবাক হচ্ছিতো!' বলল ছেলেটা, 'আমার বন্ধু সব ভেড়া কিনে নিয়েছে। তার নাকি সব সময়ের স্বপ্ন, রাখাল হবে।'

'সত্যিইতো,' সায় জানায় বয়েসি লোক, 'একেই বলে সহায়তার নীতি। তুমি প্রথমবার তাস খেলতে বসলে জিতে যাবার সম্ভাবনাই বেশি।'

'কেন?'

'কারণ তোমার লক্ষ্য পূরণের জন্য একটা শক্তি কাজ করে; সাফল্যের একটু ছোয়া দিয়ে সে তোমার ক্ষুধাকে বাড়িয়ে তোলে আরো।'

বয়স্ক লোকটা ভেড়াগুলো যাচাই করে দেখার সময় চোখ পড়ে যায় খোড়া ভেড়ার উপর। সান্তিয়াগো বলে, ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ পালের মধ্যে এ ভেড়াই সবচে বুদ্ধিমান আর তার পশমও হয় অনেক বেশি।

'গুপ্তধন কোথায়?' এবার প্রশ্ন ছুড়ে দেয় সে।

'মিশরে। পিরামিডের কাছাকাছি।'

এবার বিস্মিত হয় ছেলেটা। বয়েসি মহিলা একই কথা বলেছিল। কিন্তু বিনিময়ে কিছুই চায়নি।

'গুপ্তধন পেতে হলে, তোমাকে সুলক্ষণ অনুসরণ করতে হবে। ঈশ্বর সবার অনুসরণের জন্য এক একটা পথ তৈরি করে রেখেছেন। তোমাকে শুধু লক্ষণগুলো অনুসরণ করতে হবে।'

কোন জবাব দেয়ার আগেই তার আর বুড়ো লোকটার মাঝে তিরতির করে পাখা নাড়াতে নাড়াতে উড়ে যায় একটা চঞ্চল প্রজাপতি। সাথে সাথে মনে পড়ে যায়, প্রজাপতি সুলক্ষণ। দাদু বলেছিল। যেমন সুলক্ষণ ঝিঝি পোকা, গিরগিটি।

'ঠিক তাই,' বলল বয়েসি লোক, যেন পড়ে ফেলছে সান্তিয়াগোর সব চিন্তা, 'ঠিক যেমন শিখিয়েছিলেন তোমার দাদু। এগুলো সুলক্ষণ।'

বুকের কাপড় সরায় বয়েসি লোকটা। বিস্ময়ে থ বনে যায় সান্তিয়াগো। সেখানে ভারি একটা সোনার ঝকঝকে পাত আছে। আর বসানো আছে অমূল্য সব রত্ন। গতকাল দেখা ঝিলিকের কথা মনে পড়ে যায় তার।

এ লোক সত্যি সত্যি রাজা! চোরদের উৎপাত এড়ানোর জন্য ছদ্মবেশ ধরে আছে!

'এগুলো নাও,' সোনার পাতের মাঝখানে থাকা বড় দুটা পাথরের দিকে হাত বাড়ায় লোকটা। একটা পাথর সাদা, আরেকটা কালো। 'নাম হল উরিম আর থুমিম। কালোটা বোঝাবে *হ্যা*। আর সাদাটা *না*। যখন তুমি লক্ষণের অর্থ

ধরতে পারবে না, তখন এগুলো তোমাকে পথ দেখাবে। মনে রেখ, সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করতে হবে এগুলোকে।

'কিন্তু সম্ভব হলে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিও। গুপ্তধন আছে পিরামিডে, এটুকু তুমি ঠিকই জান। কিন্তু আমাকে ছটা ভেড়া নিতে হবে কারণ সিদ্ধান্ত ঠিক করার পথে আমি তোমাকে সহায়তা করেছি।'

সান্তিয়াগো পাউচের ভিতরে নিয়ে নেয় রত্ন দুটা। এখন থেকে নিজের সিদ্ধান্তটা সে নিজেই নিবে।

'সব সময় মনে রেখ যে যা কিছু নিয়ে তোমার কারবার সেগুলো শুধু সে বিষয়, তারচে বেশি কিছু নয়। ভুলে যেওনা সুলক্ষণের ভাষা। সবচে বেশি মনে রাখতে হবে যা, তা হল জীবনের লক্ষ্য।

'কিন্তু চলে যাবার আগে, ছোট একটা গল্প শুনিয়ে যেতে চাই।

'কোন এক দোকানি তার ছেলেকে দুনিয়ার সবচে জ্ঞানী লোকের কাছে পাঠায় অপ্রকাশিত সুখের কথা জানতে, শিখতে। বেচারা চল্লিশদিন ধরে মরুর বুকে ঘুরে ঘুরে মরে। তারপর হাজির হয় বিশাল এক পর্বতের উপর বানানো সুন্দর দুর্গের সামনে। এখানেই সে জ্ঞানীর বাস।

'সে সেখানে গিয়ে শান্ত সমাহিত এক জ্ঞানগুরুর দেখা পাবে, এমন আশা ছিল মনে। সব দেখেতো আক্কেল গুড়ুম! কেল্লার মূল কামরায় সে কী ব্যস্ততা! মানুষ কোণায় কোণায় নানা আলাপে মশগুল, বণিকেরা যাচ্ছে আর আসছে, আরেক দিকে মৃদুমন্দ বাজনা বাজছে। আর টেবিলের উপর পৃথিবীর সে প্রান্তে যত ধরনের সুস্বাদু খাবার দেখা যায় তার সব থরে বিথরে সাজানো।

'একে একে মানুষ যাচ্ছে জ্ঞানী লোকটার কাছে। তার পালা আর আসে না। পাকা দুটা ঘন্টা ব্যয় করে তারপর যাবার সুযোগ হল।

'জ্ঞানী লোকটা শান্তভাবে তার আসার ব্যাপারে সব শোনে, তারপর আরো শান্তভাবে জানায় যে এখন সুখে থাকার রহস্য জানানো যাবে না। তারচে সে প্রাসাদে ঘুরেফিরে সব দেখুক, তারপর আরো ঘন্টা দুয়েক পর।

"এদিকে আমি তোমাকে একটা কাজ করতে বলি," বলে জ্ঞানী লোকটা, দু ফোটা তেল সহ একটা চায়ের চামচ হাতে ধরিয়ে দিয়ে, "যাই কর, যেখানেই যাও, এতক্ষণ তেলটাকে চামচ থেকে পড়তে দিও না। হাতে রেখ।"

'ছেলেটা প্রাসাদের নানা গলিঘুপচি ঘুরে বেড়ায়। উঠতে নামতে থাকে নানা দৈর্ঘের সিড়ি। চোখ তেলের উপর নিবদ্ধ। এরপর ফিরে আসে সে ঘরটায়।

"তো," প্রশ্ন করে জ্ঞানী লোক, "আমার খাবার কামরায় ঝুলে থাকা পারস্যের কাপড় দেখেছ, তাই না? আর যে বাগানটা বানাতে মহামালির দশ বছর লেগেছিল সেটাওতো দেখেছ? আর লাইব্রেরির সুন্দর পার্চমেন্টগুলো?"

'অস্বস্তিতে পড়ে যায় ছেলেটা। স্বীকার করে, কিছুই দেখেনি। শুধু খেয়াল রেখেছে যেন চামচ থেকে তেলটুকু পড়ে না যায়।

"তাহলে ফিরে যাও আর দেখে এস আমার সব বিস্ময়কর জিনিস। তুমি কারো বাড়ি না দেখে তাকে বিশ্বাস করতে পার না। তাই না?"

'ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে। স্বস্তি ফিরে আসে মনে। উঠে পড়ে সে তেলের চামচ হাতে নিয়ে। এমন বাড়ি দেখতে পারাও সৌভাগ্যের ব্যাপার। এবার তার সব দেখা হয়। ঘর-দোর-দেয়াল-ছাদ সব। বাগান দেখে, দেখে চারধারের আসমান ছোয়া পাহাড়, ফুলের সৌন্দর্য, সাবধানে এনে জড়ো করা সব-সবকিছু। ফিরে যায় লোকটার কাছে।

"কিন্তু তোমার হাতে তুলে দেয়া তেলটুকু কোথায়?"

'চামচের দিকে তাকিয়ে ছেলেটা অবাক হয়ে দেখে তেল নেই সেখানে।

' "তাহলে আমি তোমাকে মাত্র একটা উপদেশ দিতে পারি।" অবশেষে বলে সবচে জ্ঞানীর চেয়েও জ্ঞানী লোকটা, "সুখের গোপন উৎস হল, তোমাকে পৃথিবীর সব বিস্ময় দেখতে হবে, সেইসাথে মনে রাখতে হবে চামচের উপর থাকা এক বিন্দু তেলের কথাও।" '

বুঝে যায় সে অর্থটুকু। একজন ভ্রমণকারী ভ্রমণ করতে পারে, কিন্তু তার পশুর পালের কথা ভুলে গেলে চলবে না।

লোকটা তাকায় তার দিকে। তারপর মুখে, কপালে বিচিত্রভাবে হাত বুলিয়ে, আঙুল দিয়ে বাতাসে নকশা কেটে চলে যায় পশুর পাল নিয়ে।

তারিফার সবচে উচু জায়গায় একটা দুর্গ আছে। মুরদের বানানো। উপর থেকে কেউ চাইলেই দেখতে পাবে আফ্রিকা। সালেমের রাজা মেলশিজেডেক সেদিন বিকালে বসে ছিল সেই দুর্গের গায়ে। ল্যাভেন্ডারের স্পর্শ নিচ্ছিল সারা গায়ে। ভেড়ার দল আশপাশে ঘোরাফেরা করে। নতুন মালিক আর নতুন পরিবেশের সাথে সাথে উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

তাদের শুধু খাবার আর পানি দরকার।

মেলশিজেডেক তাকিয়ে থাকে একটা ছোট ভেড়ার দিকে। আর কখনো দেখা হবে না রাখাল ছেলেটার সাথে, যেমন দেখা হয়নি ইব্রাহিমের সাথে। ইব্রাহিমের এক দশমাংশও সে নিয়ে নিয়েছিল। এই তার কাজ।

দেবতাদের কামনা থাকা ভাল নয়। কারণ তাদের লক্ষ্য নেই। তবু সালেমের রাজা কায়মনোবাক্যে ছেলেটার সাফল্য চায়।

আমার নামটা এক পলকে ভুলে যাবে সে, আফসোসের ব্যাপার। আবার বলা উচিত ছিল। যখন আমার কথা বলবে কাউকে, হয়ত বলবে আমি মেলশিজেডেক, সালেমের রাজা।

আকাশের দিকে তাকায় সে। তারপর বলে, 'আমি জানি, এটা গর্ব করার বিষয় নয়, প্রভু আমার। তবু, কোন এক বৃদ্ধ রাজা তার নামটা উজ্জ্বল করতে চাইলে দোষের কিছু কি আছে?'

আফ্রিকা কী অবাক করা, ভাবে সান্তিয়াগো।

তাঞ্জিয়ারের আর সব গলি-তস্য গলির শুড়িখানার মত এক মদের দোকানে বসে আছে সে। কেউ কেউ বিশাল বাশের খন্ডে করে ধূমপান করছে। বাড়িয়ে দিচ্ছে অন্যদের দিকে। মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে সে বিচিত্র সব ব্যাপার দেখছে। দেখছে লোকে হাতে হাত রেখেও হাটে। মেয়েদের মুখের উপর নামানো থাকে পর্দা। ল-ম-বা দাড়িওয়ালা সাধুরা উঠে যায় লম্বাটে টাওয়ারের শেষপ্রান্তে। তারপর সুরেলা গলায় আবৃত্তি করে কোন কবিতা। মানুষ সার দিয়ে দাড়ায়। তারপর হাটু মাটিতে ঠেকিয়ে আস্তে করে মাথা অবনত করে। নামিয়ে আনে মাটিতে।

'কৃতজ্ঞতার ধারা' নিজেকে শোনায় সে। ছেলেবেলায় গির্জায় বসে সে সন্ত সান্তিয়াগো মাতামোরোসের হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে সাদা ঘোড়ায় চড়ে থাকার দৃশ্যের কথা মনে পড়ে যায়। কেন যেন অনেক একা মনে হয় নিজেকে।

একটা ব্যাপারই তাকে এ অভিযান থেকে বিরত রাখতে পারত, ভুলে গেছে সে ব্যাপারটা। এ তল্লাটে আরবি এবং শুধু আরবি ভাষা বলা হয়।

শুড়িখানার মালিক এগিয়ে এল। পাশের টেবিলে রাখা তিতকুটে চায়ের বদলে তার একটু মদ দরকার।

এসব নিয়ে ভাবার সময় নেই। এখন ভাবতে হবে কী করে গুপ্তধন পাওয়া যায় সে বিষয়ে। ভেড়ার পাল হারিয়ে সে অনেক টাকা পেয়েছে। আর যার হাতে টাকা আছে তার আর যাই থাক, একাকীত্ব নেই। টাকা জাদু জানে। খুব দেরি না করে তাকে পিরামিডের এলাকায় যেতে হবে। হয়ত চলেও যাবে। সোনার পাত গলায় পরা এক বুড়ো লোক শুধু ছটা ভেড়া পাবার জন্য মিথ্যা কথা বলবে তা ঠিক বিশ্বাস্য নয়।

লক্ষণ নিয়ে ভাবতে ভাবতে সে গলি পেরিয়ে যায়। লোকটা কী বোঝাতে চায় সে বুঝে গেছে। আন্দালুসিয়ার প্রান্তরে অনেক লক্ষণ বিচার করে চলতে হত তাকে। চলতে হত আকাশ দেখে, বাতাস দেখে, মাটির উর্বরতা দেখে, সূর্যের উচ্চতা দেখে। জানত, নির্দিষ্ট একটা পাখি দেখা গেলে বোঝা যাবে আশপাশে নির্দিষ্ট এক ধরনের সাপ আছে। কোন এক ধরনের ঝোপ দেখলেই বুঝতে হবে কাছাকাছি আছে পানির উৎস।

ঈশ্বর যদি ভেড়ার পালকে এত ভালভাবে চালাতে জানেন, তিনি একজন মানুষকেও চালাতে পারবেন। কেমন একটা তৃপ্তি আসে মনে। চা আর তেমন খারাপ মনে হয় না।

'কে তুমি?' স্প্যানিশে প্রশ্ন ছুড়ে দিল একজন।

স্বস্তির পায় ছেলেটা। লক্ষণের কথা ভাবছিল আর তার ভাষায় কেউ প্রশ্ন করে বসল!

'আপনি স্প্যানিশ বলছেন কী করে?' পশ্চিমা পোশাকে কেতাদুরস্ত কমবয়েসি ছেলেটার দিকে তাকায় সে। তার চামড়া বলে দেয়, আসলে এ শহরেরই অধিবাসী। উচ্চতা আর বয়স একই হবে। সান্তিয়াগোর মত।

'এখানে প্রায় সবাই কমবেশি স্প্যানিশ বলতে পারে। মাত্র দু ঘন্টার পথ পেরিয়ে গেলেই স্পেন।'

'তাহলে বস দেখি। কিছু নেয়া যাক। আমার জন্য এক গ্লাস মদের জন্য বল। এ চা খেয়ে খেয়ে মুখে ঘা পড়ে যাবার দশা।'

'এ দেশে মদ নেই। এখানকার ধর্মে মদের কোন স্থান নেই।'

এখন তার যাবার কথা পিরামিডে, জানায় ছেলেটা। আর একটু হলেই গুপ্তধনের কথাও বলে ফেলত। সামলে নিল। তাহলে আরবটা কিছু অংশ চেয়ে বসতে পারে সেখানে নিয়ে যাবার বদলে। আর যা তোমার হাতে নেই সেটা দিতে চাওয়াটা এক ধরনের খারাপ কাজ।

'তুমি পারলে নিয়ে যাও না। গাইড হিসাবে নাহয় আমি কিছু টাকাপয়সা দিব।'

'সেখানে কী করে যেতে হয় সে সম্পর্কে কোন ধারণা আছে তোমার?'

দোকানি পাশেই দাঁড়িয়ে একমনে শোনার চেষ্টা করছে তাদের কথোপকথন। শুনুক। সে পেয়ে গেছে একজন গাইডকে। এখন আর হাতছাড়া করা যাবে না।

'তোমাকে পুরো সাহারা মরুভূমি পার করতে হবে।' বলছে ছেলেটা, 'আর এজন্য তোমার দরকার টাকা। আগে জানতে হবে যথেষ্ট টাকা আছে কিনা।'

প্রশ্নটা অবাক করে তাকে। একই সাথে মনে পড়ে যায় বৃদ্ধের কথা। যখন তুমি কিছু পাবার জন্য চেষ্টা করবে তখন পুরো বিশ্বব্রহ্মান্ড তা পাইয়ে দেয়ার জন্য ফিসফাস শুরু করে দিবে।

পাউচ থেকে টাকাপয়সা দেখায় সে। দোকানিও দেখেছে সামনে এসে। এরপর প্রথমে চোখাচোখি হয় ছেলেটা আর দোকানির মধ্যে, আরবিতে দু একটা কথা হয়।

'চল, চলে যাই।' বলল কালো আরব ছেলেটা, 'লোকটা আমাদের চলে যেতে বলছে।'

টাকা দিতে এগিয়ে গেল সে। জামা ধরে বসল দোকানি। তারপর রাগি রাগি গলায় অনর্গল আরবিতে কী যেন বলে গেল।

সান্তিয়াগোর গায়ে বল কম নেই। কিন্তু ভিনদেশে এসে গায়ের জোর দেখানো ভাল হবে কিনা ভেবে পায় না সে। সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে অন্য ছেলে। দোকানিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বলে, 'ও তোমার টাকাকড়ি নিয়ে নিতে চেয়েছিল। তাঞ্জিয়ার এলাকাটা বাকি আফ্রিকার মত নয়। এটা হল বন্দর। আর সব বন্দরেই চোর ছ্যাচোড়ের কোন অভাব নেই।'

নতুন বন্ধুকে বিশ্বাস করা যায়। ভয়ানক পরিস্থিতি থেকে বের করে এনেছে সে সান্তিয়াগোকে। টাকা বের করে গুণল সে।

'আমরা কালকে পিরামিডে যেতে পারি,' পয়সাগুলো হাতে নিতে নিতে বলল ছেলেটা, 'কিন্তু আমাকে আগে দুটা উট কিনতে হবে।'

তাঞ্জিয়ারের সরু পথ ধরে হেটে চলে তারা। সবখানে নানা পণ্যের পসরা। আসল বাজার বিশাল এক চত্বরে। হাজার লোকের ভিড়। দরদাম করছে, কিনছে, বিক্রি করছে। সবজি যেমন আছে তেমনি আছে তামাক। বিশাল সব ছুরিও আছে, আছে চোখ জুড়ানো গালিচা। কিন্তু নতুন বন্ধুর উপর থেকে চোখ সরানো যায় না। কারণ তার কাছেই সমস্ত পয়সা। একবার মনে হলে চেয়ে নিয়ে নেয়। কিন্তু তাতো ঠিক বন্ধুসুলভ হবে না। নতুন দেশের রীতিনীতির কিছুই জানে না সান্তিয়াগো।

'আমি শুধু তাকে দেখব।' নিজেকে শোনায় সে। গায়ের শক্তিতে সান্তি য়াগোই উতরে যাবে।

হঠাৎ সমস্ত চিন্তা তালগোল পাকিয়ে যায়। এত সুন্দর তলোয়ার এর আগে কখনো দেখেনি সে। খাপটায় রূপার এম্বস করা। হাতল কালো। দামি সব পাথর বসানো সেখানে। মিসর থেকে ফেরার সময় সে এ তলোয়ারটা কিনবে।

'দোকানদারকে একটু জিজ্ঞেস করে দেখতো তলোয়ারটার দাম কত।' বন্ধুকে বলে সে।

তার পরই মুখ ঘোরায়। সচকিত হয়ে। নড়তেও ভয় পায়। কী দেখবে কল্পনা করা সহজ।

চারপাশে ব্যস্ত মানুষ। আসছে, যাচ্ছে, আলাপ করছে। অচেনা খাবারের সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। শুধু সেই বন্ধু নেই।

বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় তার। অপেক্ষা করবে বন্ধুর জন্য। ফিরে আসবে সে। হয়ত কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তারা। কিন্তু চলে যেতে পারেনা ছেলেটা।

লম্বা টাওয়ারের উপর চলে গেছে এক সাধু। সেই বিচিত্র সুরে কী যেন পাঠ করছে। তারপর, শ্রমিক পিপড়ার বাসার মত সবাই দোকানপাট ছেড়ে চলে গেল।

পাটে যেতে বসেছে সূর্যও। ডুবতে বসেছে। আস্তে আস্তে সূর্যাস্ত হয় চত্বরের সাদা বাড়িগুলোর পিছনে। মনে পড়ে যায়, গতদিন সূর্যাস্তের সময় সে আরেক মহাদেশে ছিল। তার সাথে ছিল ষাটটা ভেড়া। আশা ছিল এক মেয়ের সাথে দেখা হবে। সেখানকার সব খানাখন্দ তার হাতের তালুর মত স্পষ্ট। সেখানকার সব মাঠ তার চেনা। এরপর কী হবে তাও জানা। কিন্তু আজ একেবারে অচিন এক দেশে কপর্দকহীন দাঁড়িয়ে আছে সে। কোন ভেড়া নেই, অর্থ নেই এমনকি ভাষাটা পর্যন্ত অজানা। আজ আর সে রাখাল নয়। দেশে ফিরে যাবার টাকাটাও নেই হাতে।

একবার সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের মধ্যে এতকিছু হয়ে গেল! এত দ্রুত জীবনটা বদলে যাবে কখনো কল্পনা করেনি।

এত খারাপ লাগছে যে পারলে কেঁদে ফেলে। ভেড়াগুলোর সামনে কোনদিন একটুও কাঁদেনি। সে কাঁদে কারণ চত্বরে আর কেউ নেই, কারণ ঈশ্বর ন্যায়বিচার করেননা, কারণ তিনি এভাবে স্বপ্নদ্রষ্টাদের শাস্তি দেন।

ভেড়া থাকতে আমি ছিলাম সুখি, যেসব মানুষ আমাকে দেখত, স্বাগত জানাত। কিন্তু এখন একেবারে নিঃস্ব। লোকে বিশ্বাস করবে না। ঠকেছি যে! যারা নিজের সম্পদ পেয়ে গেছে তাদের ঘৃণা করব কারণ আমি আমারটা পাইনি। এখন নিজের যেটুকু আছে সেটা নিয়েই পথ চলতে হবে। দিগ্বিজয়ী হবার তুলনায় আমি কিছুই নই।

পাউচ খোলে সে। কী আছে? জাহাজে খেয়ে রেখে দেয়া কিছু আছে নাকি? বইটা আছে, আছে ভারি জামা, আর আছে বুড়ো লোকটার দেয়া পাথরদুটা।

পাথরে চোখ পড়ে মনে পড়ে গেল আশার কথা। ছটা ভেড়ার বিনিময়ে সে সোনার পাত থেকে তুলে আনা দুটা রত্ন পেয়েছে। এগুলো বেচে দিলে ফিরে যাবার টিকিটটা অন্তত কাটা যাবে।

এবার আর ঠকব না আমি। এটা বন্দরনগরী, আর বন্দরে আছে চোর ছ্যাচোড়ের দল। রত্ন দুটাকে পকেটে রেখে দেয় সে।

এবার সে দোকানির ব্যাপারটা বুঝতে পারে। আসলে পানশালার লোকটা ঐ বন্ধুর কথা বলছিল। তাকে যেন বিশ্বাস না করে। 'আমিতো আর সবার

মত, যা বিশ্বাস করার চেষ্টা করি তাই বিশ্বাস করি। যেভাবে দেখার চেষ্টা করি সেভাবেই দেখি।'

পকেটে হাত বুলিয়ে নেয়ার সাথে সাথে অনুভব করে পাথরগুলো, অনুভব করে সেই কথা, 'কিছু পাবার চেষ্টা করলে পুরো বিশ্বব্রহ্মান্ড তোমাকে তা পাইয়ে দেয়ার জন্য ফিসফাস করতে থাকবে।'

এ কথার পূর্ণ অর্থ এখনো ধরতে পারেনি সে। এখন পড়ে আছে শূণ্য বাজারে। একটা ফুটা পয়সা নেই হাতে। রক্ষা করার জন্য কোন ভেড়া নেই।

কিন্তু এ পাথরগুলোই প্রমাণ করবে যে সে এমন এক রাজার সাথে দেখা করেছে যে তার অতীত জানত একেবারে আয়নার মত ঝকঝকে মন নিয়ে।

'এগুলোর নাম উরিম আর থুমিম। এরা তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। লক্ষণ চিনতে সাহায্য করবে।'

পরখ করে দেখা যাক না। প্রথমে সে পাথরদুটাকে পাউচে রেখে দেয়। সুস্পষ্ট প্রশ্ন করার জন্য তুলে আনে একটা।

'বৃদ্ধের আশীর্বাদ এখনো আমার উপর আছে?'

কালো পাথর। হ্যা।

'আমি কি আমার লক্ষ্যে পৌছতে পারব?'

বলেই আবার হাত ঢোকায় পাউচে। ফাঁক গলে পাথর দুটা পড়ে গেছে। সেখানে যে ছিদ্র ছিল তাও সে জানত না। এ ফাঁকে আরেক কথা মনে পড়ে।

'লক্ষণ চেনার চেষ্টা কর, তারপর অনুসরণ কর সেগুলোকে।' বলেছিল বয়েসি লোকটা।

সুলক্ষণ। ফিক করে হেসে ফেলে সান্তিয়াগো। পাউচে পুরে ফেলে সেগুলোকে। ছিদ্র একটা আছে, সেখান দিয়ে যে কোন সময় পড়ে যেতে পারে পাথরগুলো। সেসবের পরোয়া নেই। অন্য চিন্তা ঘুরছে মাথায়।

'আমাকে আমার নিজের লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। নিতে হবে নিজের সিদ্ধান্ত।' শোনায় নিজেকে।

মনে কেন যেন শান্তির পরশ। বয়েসি লোকটা এখনো তাকে আশীর্বাদ করছে। খালি হয়ে যাওয়া বাজারের মাঝে দাড়িয়ে চারদিকে তাকায় সে। জায়গাটা অদ্ভুত নয়, নতুন।

হাজার হলেও, সে নূতন এক তল্লাটে এসে হাজির হয়েছে। এমন এক জায়গা, মাত্র দু ঘন্টার পথ দূরে, যেখানকার কথা রাখালরা ধরতে গেলে জানেই না। নতুন ধরনের মানুষ, নতুন আচরণ, নতুন ব্যবস্থা আর নতুন সব পণ্য। মন খারাপ লাগে তলোয়ারের কথা মনে পড়লে, কিন্তু সে দেখেছে তো! পিরামিডে যেতে না পারলেও এসব মন্দ কী? চোরের নিকুচি করে সে। কত চোর আরো গরিব সব মানুষের সর্বনাশ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। কত অভিযাত্রি, কত মানুষ সর্বশান্ত হয়ে যায়!

'আমি এক অভিযাত্রি, গুপ্তধনের সন্ধানে বেরিয়েছি।' নিজেকে শোনায় সে।

কে যেন ঝাঁকিয়ে জাগানোর চেষ্টা করছে তাকে। এক ঘুমন্ত বাজারের ঠিক মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। এখন এখানে বয়ে যাবে জীবনের স্রোত।

উঠে বসেই যখন ভেড়াগুলোকে জাগানোর জন্য চারপাশে তাকায়, বিচিত্র এক অনুভূতি হয়। খুব বেশি কষ্ট নয়। নতুন এক জায়গায় আছে সান্তিয়াগো। এখন আর ভেড়ার জন্য খাবার পানির জন্য হন্যে হয়ে মরতে হবে না। চাইলেই গুপ্তধনের খোজে বের হওয়া যায়। পকেটে কানাকড়ি নেই তো কুছ পরোয়া নেই। আছে বিশ্বাস। কাল রাতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে, বইতে পড়া আর সব অভিযাত্রির মত সেও খুশি থাকবে, তাদের মত অভিযাত্রি হবে।

ব্যস্ত হয়ে উঠছে বাজার। চকলেট বিক্রি করার লোকটার মুখে কী নির্মল হাসি। সে জানে কী করতে হবে, কী করছে। জীবনে সুখ আছে তার। বুড়ো অচেনা রাজার কথা মনে পড়ে যায় তার।

'এ চকলেটওয়ালা কোন বণিকের মেয়েকে বিয়ে করার জন্য চকলেট বিকিকিনি করে না। সে কাজটা করতে চায়, এজন্য করে।' সিদ্ধান্তে আসে সে।

সে-ও তো বুড়ো লোকটার মত একই কাজ করতে পারে। যারা লক্ষ্য থেকে দূরে সরে গেছে বা খুজে পাচ্ছে না তাদের সাহায্য করতে পারে। শুধু তাদের দিকে তাকাতে হবে। তাদের মনোভাব বুঝতে হবে। তবু, আগে কখনো করেনি।

চকলেটওয়ালা তার দিনের শুরু করল সান্তিয়াগোকে একটা সেধে। ধন্যবাদ জানিয়ে তুলে নেয় সে জিনিসটুকু। তারপর এগিয়ে চলে সামনে। টের পাচ্ছে, অস্থায়ি দোকানগুলো সাজানোর সময় একজন আরবিতে কথা বলেছিল। বাকিরা স্প্যানিশে।

একে অন্যকে বুঝাতেও পারছিল বেশ ভালভাবে।

নিশ্চই এমন কোন ভাষা আছে যেটা শব্দের উপর ভর করে চলে না? আগেই ভেড়ার সাথে আমার এমন হয়েছিল, এখন হচ্ছে মানুষের সাথে।

অনেক নতুন বিষয় শিখছে সে। কোন কোন ব্যাপার আদৌ নতুন নয়, জীবনে আগেও এসেছে, কিন্তু অনুভব করছে নতুনভাবে। আগে টের পায়নি

কারণ অভ্যাস ধরে গিয়েছিল। ভাবে, যদি আমি এসব ভাষা বুঝতে পারি তাহলে বুঝতে পারব বিশ্বটাকে।

মন শান্ত করে নিয়ে সে স্থির করে, তাঞ্জিয়ারের গলি ধরে এগিয়ে যাবে। এছাড়া লক্ষণ বোঝার তো কোন উপায় নেই। পথ চলায় কোন ক্লান্তি থাকার কথা নয় রাখাল ছেলের। আসলে, এসব শিখে আসায় কাজে দিচ্ছে। এক একটা শিক্ষা অন্য ক্ষেত্রেও অসাধারণ প্রভাব ফেলে।

'সবই আসলে এক।' বলেছিল বয়েসি রাজা।

স্ফটিকের বণিক জেগে ওঠে সকাল সকাল। নিত্যদিনের মত আজও মনে সেই অস্থিরতা। ত্রিশ বছর ধরে একই জায়গায় কাজ করে। পাহাড়ের পাশে। খুব কম ক্রেতা যায় এদিক দিয়ে। এখন আর বদলে দেয়া যাবে না ব্যাপারগুলোকে। সে খুব কষ্টে যেটা শিখেছে, তা হল, স্ফটিকের জিনিসপাতি কেনা এবং বেচা। এককালে অনেক মানুষ চিনত তার দোকানটা: আরব বণিক, ফরাসি আর ইংরেজ ভূতত্ত্ববিদ, উচু হিল পরা জার্মান সেনা।

সেসব দিনে মনে হত স্ফটিক বেচা খুব ভাল কাজ। বয়সটা আরেকটু বাড়ুক, ধনী হবে সে, তারপর অনেক মেয়ে পাওয়া শুধু মুখের কথা।

কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বদলে গেল তাঞ্জিয়ার। পাশের সিউটা শহর কোত্থেকে শুরু হয়ে চো চো করে চলে গেল তাঞ্জিয়ারকে ছাড়িয়ে। পড়ে গেল বেচাকেনার হার। আস্তে ধীরে সরে গেল প্রতিবেশীরা। এখন পাহাড়ের উপর হাতেগোণা কয়েকটা দোকান পাওয়া যাবে। সামান্য কয়েকটা ছোটখাট দোকান ঘুরে দেখার জন্য কে চড়বে পাহাড়ের গায়ে?

কিন্তু স্ফটিক ব্যবসায়ীর আর কোন উপায় নেই। এক কাজ করতে করতে টানা ত্রিশটা বছর কাটিয়ে বসে আছে। এখন নতুন কী করবে!

রাস্তায় লোকে যাতায়ত করে সামান্যই, সেদিকে তাকিয়ে থাকে সে মনমরা হয়ে। এ কাজ করতে করতে এখন সবার সময়-মাত্রা জানা হয়ে গেছে। কিন্তু খাবার সময়ের ঠিক আগে আগে এক ছেলে হাজির হল দোকানের সামনে। পরনে সাদাসিধা পোশাক, আর স্ফটিক বণিকের ধুরন্ধর চোখ একবার দেখেই বুঝতে পারে এ ছেলের কিছু কেনার মত টাকা নেই। তবু, কেন যেন সে খাবারের ব্যাপারটা মিনিট কয়েকের জন্য পিছিয়ে দিল। দেখা যাক না, কী কথা হয় ছেলেটার সাথে।

দরজার বাইরে একটা কার্ড ঝুলছে। লেখা– এখানে অনেক ভাষায় কথা বলা যাবে। কাউন্টারের পিছন থেকে এগিয়ে এল এক লোক।

'আপনি চাইলে জানালায় রাখা কাচগুলো পরিষ্কার করে দিতে পারি,' বলল ছেলেটা, 'এখন যে ছিরি হয়েছে, তাতে কারো কেনার রুচি থাকবে না।'

কোন জবাব না দিয়ে লোকটা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

'বিনিময়ে নাহয় খাবার জন্য কিছু দিবেন।'

লোকটা এখনো কোন কথা বলল না। সে একবার ভাবে রত্নগুলোর কথা। মরুভূমিতে কোন কাজে লাগবে না। ভারি জামা বের করে মুছতে শুরু করে স্ফটিকগুলো। আধঘন্টার মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যায় জানালায় রাখা সব। এর মধ্যে দুজন খদ্দের এসে কিনেও নেয় কিছু কিছু।

কাজ শেষ করে বণিকের কাছে খেতে চায় কিছু।

'চল দেখি, খাওয়া যায় নাকি কিছু।' বলে বণিক।

সামনে ছোট সাইন ঝুলিয়ে চলে যায় কাছের ছোটখাট কাফেতে। জায়গামত, একমাত্র টেবিলে বসার পর হেসে ওঠে স্ফটিক ব্যবসায়ী।

'তোমার কিছু পরিষ্কার করার দরকার ছিল না। কোরান বলেছে, আমার কাউকে খাওয়াতে হবে।'

'আচ্ছা! তাহলে কাজটা করতে দিলেন কেন?'

'কারণ স্ফটিকগুলো আসলেই নোংরা হয়ে গিয়েছিল। আর আমাদের দুজনের মন থেকেই না বোধক চিন্তা সরানো জরুরি হয়ে পড়েছিল।'

খাবার শেষ হলে সান্তিয়াগোর দিকে তাকায় বণিক লোকটা।

'আমার দোকানে কাজ করবে নাকি? কাজ করার সময় দুজন খদ্দের আসে। ভাল লক্ষণ, কী বল?'

লোকে লক্ষণ নিয়ে খুব ভাবে, ছেলেটা সিদ্ধান্তে এল। বলে তারচে বেশি। কিন্তু ভিতরে থাকা অর্থটা ধরতে পারে না। যেমন অনেক বছর ধরে বুঝতেই পারিনি কথা ছাড়াই কী এক ভাষায় যেন কথা বলি আমি ভেড়াগুলোর সাথে।

'বল? কাজ করবে আমার সাথে?'

'আজ দিনটার জন্য করতে পারি। এমনকি সূর্য ওঠা পর্যন্ত সারারাত ধরে কাজ করতেও কোন আপত্তি নেই। দোকানের প্রতিটা টুকরা সাফসুতরো করে দিব। বিনিময়ে আপনি আমাকে মিশর যাবার টাকা দিবেন। কালই।'

হাসল বণিক, 'এমনকি তুমি যদি সারা বছর ধরে আমার স্ফটিকগুলো পরিষ্কার করে যাও, প্রতিটা বিক্রি থেকে পাও মোটা অঙ্কের টাকা, তবু মিশরে

যাবার জন্য ধার করতে হবে তোমাকে। এখান থেকে সেখানে হাজার কিলোমিটারের মরুভূমি। বলা উচিত আরো অনেক বেশি।'

এরপর এত লম্বা একটা নিরবতা নেমে আসে যে মনে হয় পুরো শহর ঘুমিয়ে গেছে আচানক। কোন বাজার নেই, বাজারে নেই দরকষাকষি, মুয়াজ্জিনের আজান নেই, নেই নতুন দেশ, নতুন চাওয়া, এমনকি নেই সেই পুরনো রাজা। পিরামিড বলেও কিছু নেই এ জগতে। পুরো জগত যেন থেমে গেছে, কারণ থমকে গেছে ছেলেটার হৃদয়।

সে বসে আছে সেখানে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাইরে। যদি এখন মরে যেতে পারত সে, যদি থেমে যেত সবকিছু!

অবাক হয়ে সান্তিয়াগোর চোখেমুখে চেয়ে থাকে বণিক। সকালে দেখা সব আনন্দ উবে গেছে কী করে যেন।

'দেশে ফিরে যাবার টাকাটা দিতে পারি আমি তোমাকে, বাবা,' অবশেষে বলে স্ফটিক ব্যবসায়ী।

সান্তিয়াগোর মুখে কোন জবাব নেই। উঠে দাঁড়ায়, টেনেটুনে ঠিক করে সবকিছু, তারপর হাতে তুলে নেয় পাউচটা।

'আমি আপনার জন্য কাজ করব।' বলে সে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলে শেষ কথাগুলো, 'টাকা দরকার। ভেড়া কিনে আনার টাকা।'

THE ALCHEMIST

দ্বিতীয় অংশ

মাসখানেক হল কাজ করছে সান্তিয়াগো। স্ফটিক-দোকানে কাজ করে কেন যেন মনে ঠিক শান্তি নেই। কাউন্টারের পিছন থেকে দোকানি অহর্নিশি তাকে উপদেশ দিয়ে চলে। সাবধান হতে হবে। কিছু যেন ভেঙে না যায়।

তবু সে সেখানেই আছে। কারণ বুড়ো ভাম হলেও বণিক লোকটা তার সাথে ভাল ব্যবহার করে, ন্যায্য ব্যবহার করে। প্রতিটা পণ্যের জন্য ভাল একটা পয়সা জুটে যায় তার কপালে। আর পাই পাই করে জমায় সে সেগুলো। খানিকটা হয়েও গেছে। হিসাব কষে ফেলল একদিন। এভাবে হররোজ খাটলেও বছর লেগে যাবে কয়েকটা ভেড়া কিনতে।

'আমি এক কাজ করি, স্ফটিকগুলোর জন্য একটা ডিসপ্লে কেস বানিয়ে ফেলি। বাইরে, পাহাড়ের গোড়ায় যারা যাতায়ত করে তাদের দেখাব। কী বলেন?'

'আমি এ সাহস দেখাইনি কখনো। লোকে যাবার সময় এক দুটা ধাক্কা দিয়ে গেলেই কেল্লা ফতে।'

'তাহলে আমার রাখাল জীবনের কথা বলি। মাঝে মাঝে পাল নিয়ে সাপের কাছে চলে এলে দু একটা ভেড়া মারা যায়। কিন্তু রাখালের জীবন এজন্য থেমে থাকবে না। এগিয়ে যেতে হবে।'

স্ফটিক দেখতে চাচ্ছে এক ক্রেতা। আজকাল সেই সময়ের কথা মনে পড়ে যায়, যখন তাঞ্জিয়ারের সবচে ব্যস্ত রাস্তা ছিল এটা।

'ব্যবসার কিন্তু সত্যি সত্যি উন্নতি হয়েছে,' ছেলেটাকে বলে সে, খরিদ্দার চলে যাবার পর, 'ভালই করছি, কী বল? তোমার ভেড়ার পাল পেতে বেশি দেরি নেই। জীবন থেকে বেশি কিছু চাও কেন?'

'কারণ আমাদের লক্ষণ দেখে চলতে হবে।' বলেই ভুল বুঝতে পারে ছেলেটা। কারণ এ বণিক কখনো সালেমের মহান রাজার দেখা পায়নি। যে পায়নি, সে লক্ষণের মর্ম বুঝবে না।

'একে বলে সৌভাগ্যের নীতি। যে শুরু করে তার কপাল। কারণ জীবন চায় তোমার লক্ষ্য অর্জিত হোক।' বলেছিল সেই সে বুড়ো লোক।

যা বোঝা বুঝে নিয়েছে বণিক। দোকানে সান্তিয়াগোর আসাটা আসলেই সুলক্ষণ। কিন্তু ছেলেটাকে কাজে নিয়ে পস্তাতে শুরু করল সে এক সময়। প্রাপ্যেরচেও বেশি নিচ্ছে সান্তিয়াগো। টাকার পাল্লা আরো ভারি হত তাকে আর একটু কম দিলে। তার আশা, ছেলেটা দ্রুত ফিরে যাবে ভেড়ার পালের দিকে।

'পিরামিডে যেতে চাইতে কেন?'

'কারণ সব সময় সেগুলোর কথা শুনে এসেছি।'

স্বপ্নের কথা বেমালুম গাপ করে যায় সে।

কথা শুনে প্রথমে থমকে গিয়েছিল দোকানি। তারপর আবেগ চেপে রেখে বলে, 'আমার ধর্মে পাঁচটা কর্তব্য আছে। চারটা যে কেউ যে কোন জায়গায় পালন করতে পারে। নামাজ পড়া হল তেমনি এক কাজ। নিজের সম্পদ গরিবদের দেয়া, রোজা রাখা তেমনি কাজ।'

থেমে যায় বণিক। চোখে অশ্রু। মনে মনে কিছু কথা বলে নবিকে উদ্দেশ্য করে। ইসলামি আইনের সবটুকু মানার ইচ্ছা ছিল তার।

'পঞ্চম বাধ্যবাধকতাটা কী?' প্রশ্ন করে সান্তিয়াগো।

'দুদিন আগে বলেছিলে না, আমার ঘোরাঘুরি করার কোন স্বপ্নই নেই? হায়রে! সব মুসলমানের পঞ্চম বাধ্যবাধকতা হল তীর্থযাত্রা করা। হজ করা। জীবনে অন্তত একবার পবিত্র মক্কা নগরীতে যাবার কথা আমাদের।

'মক্কা পিরামিডেরচে অনেক বেশি দূরে। তরুণ ছিলাম যখন, সব সময় মনে ছিল একটা স্ফটিক ব্যবসা দেয়ার চিন্তা। কী করে টাকা জমিয়ে শুরু করা যায় সে চিন্তা। কোন একদিন টাকাপয়সা হবে, তারপর যেতে পারব মক্কায়।

'দিন পেরিয়ে যায়। আস্তে আস্তে টাকা জমে। যাবার মত টাকা হয়ে গেছে আমার। দোকানটা কার কজায় রেখে যাব? একদিকে স্ফটিক একেবারে স্পর্শকাতর জিনিস, আরেকদিকে দোকানের সামনে দিয়ে লোকে এগিয়ে যায় মক্কার দিকে। কেউ কেউ ধনী। সাথে আছে বিশাল সফরসঙ্গি। উটের পাল, দাস, সহকারি। কিন্তু বাকিদের বেশিরভাগই আমারচে হতদরিদ্র।

'যারা গেছে, ফিরে এসে সে কী আনন্দ! বাড়ির দরজায় টাঙিয়ে রাখে হজের চিহ্ন। তাদের একজন, পেশায় মুচি। বলেছিল, বছর ধরে মরুভূমিতে চলতে কোন ক্লান্তি লাগেনি। ক্লান্তি এসেছে এই তাঞ্জিয়ারের বাজারে জুতা বানানোর চামড়া কিনতে যাবার সময়।'

'তাহলে এখন মক্কায় যাচ্ছেন না কেন?'

'কারণ মক্কা যাবার আশাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। একই ধরনের দিন, একই দোকান, একই রকম জিনিস, একই খাবার দোকানের বস্তাপচা খাবার– তবু একটা আশা মনে। ভয় হয়, স্বপ্নটা ক্ষয়ে গেলে বেঁচে থাকার আর কোন ইচ্ছাই অবশিষ্ট থাকবে না মনে।

'তোমার স্বপ্ন ভেড়ার পাল আর পিরামিড। আমার আর তোমার মধ্যে তফাতটা কোথায় জান? তুমি স্বপ্নটাকে সত্যি করে পেতে চাও আর আমি ভয় পাই।

'মরুভূমি পেরিয়ে যাবার কথা কল্পনা করেছি হাজারবার। পবিত্র পাথরের চত্বরে হাজির হলাম। তারপর স্পর্শ করার আগে চারপাশে ঘুরলাম সাতবার। আমার আশপাশে থাকা লোকজনের কথা ভেবেছি অনেকবার। আমরা কথা বলব। বলব প্রার্থনার কথা। প্রাপ্তির কথা। কিন্তু ভয় হয়, এসবই হয়ত খুব বেশি খুশি করতে পারবে না আমাকে, তবু, মনে সেই স্বপ্ন।'

সেদিনই বণিক লোকটা সান্তিয়াগোকে অনুমতি দেয়। পথের পাশে পাহাড়ের গোড়ায় এক ডিসপ্লে কেস বানানোর অনুমতি।

সবাই তার স্বপ্নগুলোকে একভাবে সত্যি হতে দেখে না।

কেটে গেছে আরো দুটা মাস। বাইরের তাকটা দেখে অনেক ক্রেতা ভিড় করে দোকানে আজকাল।

ছ মাস। আর ছ মাস কাজ করলেই ফিরে যাওয়া যাবে স্পেনে। তারপর ষাটটা ভেড়া কিনে নেয়ার পালা। তারপর আরো ষাটটা। এক বছরের মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে যাবে পাল। ব্যবসা শুরু করা যাবে আরবদের সাথে। বিচিত্র ভাষাটা এখন বেশ রপ্ত হয়ে গেছে তো!

সেদিন, সেই সকালের পর আর কখনো সে উরিম আর থুমিমকে ব্যবহার করেনি। এখন তার কাছে মিশরের স্বপ্ন আর বণিকের কাছে মক্কার স্বপ্ন এক সমান। চোখে নতুন স্বপ্ন, তারিফায় ফিরে যাবে বিজয়ীর বেশে।

'তোমার সব সময় ঠিকভাবে জানতে হবে, কী চাও।' এখন সে জানে। হয়ত কোনদিন মরুভূমির বুকে সেই চোরের সাথে দেখা হয়ে যাবে। তারপর নিয়ে নেয়া যাবে টাকাপয়সা। তার প্রাপ্য কষ্টের টাকা। তখন দ্বিগুণ হবে ভেড়ার পাল।

সান্তিয়াগো নিজেকে নিয়ে গর্বিত। কাজ করে আনন্দ পায় আজকাল। শিখেছে অনেক নতুন ব্যাপার। কী করে স্ফটিকের কাজ করতে হয়, কী করে কথা বলতে হয় শব্দ ছাড়া... কী করে চিনতে হয় লক্ষণ।

এক বিকালে সে পাহাড়ের উপর এক লোকের দেখা পায়। লোকটা আক্ষেপ করে বলছে যে এখানে এত কষ্ট করে ওঠার পর পান করার মত কোন কিছু নেই।

লক্ষণ ঠিক ঠিক ধরে ফেলে সান্তিয়াগো। পরদিনই সে বলে বসে যে পাহাড়ে চড়তে আসা লোকজনের জন্য চা বিক্রি করা ভাল হতে পারে।

'আশপাশে অনেক দোকানে চা বিক্রি হয়।'

'তাহলে আমরা স্ফটিকের কাপে বিক্রি করব। চা ভাল লাগবে তাদের। ভাল লাগবে গ্লাসগুলোও। যদি কিনে নেয়, তোফা। সৌন্দর্য সব সময় মানুষকে গলিয়ে ফেলে।

কোন সাড়া নেই বণিকের দিক থেকে। কিন্তু সে বিকালে নামাজ পড়ে দোকানের ঝাপ ফেলে ডাকে ছেলেটাকে। এগিয়ে দেয় ধূমপানের বিচিত্র সরঞ্জাম, যাকে আরবিতে হুকা বলা হয়।

'তুমি আসলে কী খুজছ?'

'আগেই বলেছি। আগে ফিরে পেতে হবে ভেড়ার পাল। তারপর টাকা। তারপর বাকি কাজ।'

হুকাতে আরো কিছু কয়লার টুকরা দিয়ে কষে দম নেয় দোকানি।

'তিরিশ বছর ধরে দোকান চালাই আমি। এই একই দোকান। স্ফটিকের নাড়িনক্ষত্র আমার হাতের তালুতে। এখন, স্ফটিকে করে চা বিক্রি করলে দোকানের পসার বাড়বে, কোন সন্দেহ নেই। তখন জীবনের ধারাটা বদলে নেয়া যাবে।'

'তাহলে, ভাল না?'

'আমি সব দেখেশুনে, যা যেমন আছে তা তেমন দেখে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু এগিয়ে গেছে বন্ধুরা। কেউ হয়েছে ব্যাঙ্কডাকাত, কেউ ডাকাতির শিকার, বাকিরা উন্নত।

'সব সময় ভাবতাম আমার কপাল মন্দ। আসলে তা নয়। আমি দোকানটাকে সারা জীবন এ আকারেই দেখতে চেয়েছিলাম। তাই বাড়েনি। পরিবর্তনকে ভয় পাই কারণ জানি না পরিবর্তনের পর কী আসবে। যেমন আছি তেমন থাকতেই অভ্যাস ধরে গেছে একেবারে।'

কী আর বলা যায় এ কথার পিঠে? বুড়ো দোকানদার বলে চলেছে এক নাগাড়ে, 'আমার জীবনে তুমি এক আশীর্বাদ। আজ এমন সব জিনিস দেখতে পাই যা আগে দেখতাম না। মানে বুঝতাম না। যে আশীর্বাদকেই তুমি অবজ্ঞা

করবে সেটা হয়ে যাবে অভিশাপ। এখন সব বুঝি, সেই সাথে বেড়েছে হতাশা। বুঝতে পারছি, আসলে আমি পরিবর্তন চাই না। সেটাই কষ্ট দেয় খুব।'

তারিফার কোন এক রুটিওয়ালার জীবনের সাথে মিলে যাচ্ছে কাহিনী।

নেমে যাচ্ছে সূর্য। চলছে ধূমপান। তাদের কথা চলে আরবিতে। আর ছেলেটা সেজন্য গর্বিত। এক সময় মনে হত দুনিয়ায় যা শিখে নেয়ার শেখা যাবে ভেড়ার কাছ থেকে। কিন্তু আরবি?

আসলে ভেড়ারা খুব বেশি কিছু শিখাবে পারবে না। তাদের লক্ষ্য শুধু খাবার আর পানীয়। তুমি বরং তার জীবন থেকে এম্নি এম্নি নিজে নিজে কিছু শিখে নিতে পারবে।

'মাকতুব।' অবশেষে বলে বণিক।

'কথাটার মানে কী?'

'মানে বুঝতে হলে আসলে তোমাকে আরবে জন্মাতে হবে। তোমার ভাষায় মোটামুটি বলা চলে, *কথাটা লেখা ছিল।*'

তারপর, হুকা থেকে কয়লা সরাতে সরাতে মৃদুভাবে সান্তিয়াগোকে জানায় সে, চা বিক্রি করা যায়। বিক্রি করবে সে।

সব সময় নদী বেধে রাখা কোন কাজের কথা নয়।

পাহাড়চূড়ায় উঠে গেছে লোকটা। চরম ক্লান্তি দুজনের সারা গায়ে। তারপর সেখানে যখন স্ফটিকের এক দোকান দেখতে পায়, দেখতে পায় দারুণ চা পাওয়া যায়, পান করতে যায় তারা।

কী সুন্দর দামি স্ফটিকের গ্লাসে দেয়া হচ্ছে সামান্য চা টুকু!

'আমার স্ত্রী কখনো এসব ব্যবহারের কথা ভাবেনি।' লোকটা সে সন্ধ্যা কাটায় স্ফটিক ব্যবসায়ির সাথে। সেইসাথে কিনে নেয় অনেকগুলো স্ফটিকের পাত্র।

দ্বিতীয়জনের মত ভিন্ন। চা চা-ই। স্ফটিকে দাও আর যেখানেই দাও।

তৃতীয়জন বলে, প্রাচ্যে স্ফটিকে করে চা দেয়া চূড়ান্ত সৌজন্য আর সৌভাগ্যের প্রতিক। জাদুর শক্তি আছে স্ফটিকে।

বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়ে কথাগুলো। লোকে শুধু দোকান আর দোকানের নতুন কায়দা দেখার জন্যও উঠে আসে। যে দোকানের স্ফটিক এত

সুন্দর সেখানে চা তো ভাল হবেই। অন্য দোকানগুলোও আস্তে আস্তে একই পথ ধরে। স্ফটিকের বিক্রি বেড়ে যায় বহুগুণে। একই সাথে তাদের কেউ তো আর পাহাড়ের চূড়ায় নেই!

আস্তে আস্তে আরো দুজন কর্মচারি ভাড়া করতে হয় বণিককে। কত চা আর কত স্ফটিক যে কিনতে হয় তাকে! লেখাজোকা নেই।

কেটে যায় মাসের পর মাস।

সূর্যাস্তের আগেই জেগে ওঠে ছেলেটা। আফ্রিকায় আসার পর পাকা এগারো মাস ন দিন কেটে গেছে।

সাদা লিলেনের লম্বাটে আরবি পোশাক পরে নেয় সে। শুধু আজকের দিনের জন্য কিনে আনা পোশাক। উটের চামড়া দিয়ে বেধে নেয় মাথার রুমালটা। নূতন চপ্পল পায়ে দিয়ে নিঃশব্দে নেমে আসে সিড়ি বেয়ে।

এখনো ঘুমে কাতর পুরো শহর। কয়েকটা স্যান্ডউইচ বানিয়ে খেয়ে নেয় গরম গরম চা। স্ফটিকের পাত্রে করে। তারপর বসে পড়ে হুকা নিয়ে, সূর্যের আলো পড়ছে যে দরজায়, সেখানে।

কোনদিকে খেয়াল নেই তার। মরুর বাতাস ঝাপ্টা মারে চোখেমুখে। ধূমপান শেষ হলে হাত ঢোকায় পকেটে। কী তুলে আনবে সেখান থেকে ভেবে পায় না। বসে থাকে কয়েক মিনিট।

বেরিয়ে আসে একতাড়া টাকা। একশ বিশটা ভেড়া কিনে নেয়ার মত টাকা, ফিরে যাবার ভাড়া, আফ্রিকা থেকে জিনিসপাতি নিজের দেশে আনা-নেয়ার ব্যবসা করার ছাড়পত্র নেয়ার টাকা।

উঠে এসেছে বণিক। দুজনে মিলে আরো একটু চা পান করে।

'চলে যাচ্ছি আজ,' অবশেষে বলে ওঠে সান্তিয়াগো, 'ভেড়া কেনার টাকা হয়ে গেছে। মক্কা যাবার টাকা হয়ে গেছে।'

কোন জবাব নেই বয়েসি লোকটার কণ্ঠে।

'আশীর্বাদ করবেন না? অনেক সহায়তা করেছেন আমাকে।'

এখনো লোকটা চা তৈরি করছে। জবাব দেয় না কোন কথার। অবশেষে ফিরে তাকায়।

'আমি তোমাকে নিয়ে গর্বিত। দোকানের হালচাল পাল্টে দিয়েছ তুমি। কিন্তু আসলে আমি তো মক্কায় যাব না। যেমন তুমিও জান, কিনে আনা হবে না ভেড়ার পাল।'

'কে বলেছে এসব কথা?'

'মাকতুব।'

অবশেষে সান্তিয়াগো আশীর্বাদ পায়।

তিন তিনটা বোঝা নিয়ে ঘুরে দাড়ায় সে পুরনো পাউচটার দিকে। তুলে নেয় সেটা, তারপর পুরনো ভারি জামাটা নিতে নিতে ভাবে, পথে কাউকে দিয়ে দেয়া যাবে।

এবং ভারি জামার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে উরিম আর থুমিম। পড়ে যায় মাটিতে।

মনে পড়ে যায় বুড়ো লোকটার কথা। পাক্কা একটা বছর পেরিয়ে গেল। ভুলেই গিয়েছিল। সব ভুলে টাকার চিন্তা আর কঠিন শ্রম। স্পেনে ফিরে যাবে সে, কিনবে ভেড়ার নতুন পাল।

'কখনো স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিওনা,' বলেছিল সালেমের রাজা, 'অনুসরণ করো ভাল লক্ষণগুলোকে।'

পাথর দুটাকে কুড়িয়ে নিতে নিতে ভাবে সে, এক বছর ধরে খেটেছে। এখন ফিরে যাবার ইঙ্গিত দিল উরিম আর থুমিম।

আগে যা করে এসেছি সেসব করতেই ফিরে যাচ্ছি আমি। যদিও ভেড়ার পাল আমাকে আরবি শিখাতে পারবে না, তবু ফিরে যাচ্ছি।

কিন্তু আরো গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার শিখিয়েছে ভেড়ার পাল। বিশ্বে কথার উপরেও একটা ভাষা আছে। যে ভাষা দিয়ে সে দোকানটাকে উঠিয়ে দিল অনেক উপরে। ভালবাসা আর প্রত্যয় নিয়ে গড়ে ওঠা ভাষার নাম উৎসাহ। চাওয়ার কিছু পাবার চেষ্টা করার ভাষা।

এখন তাঞ্জিয়ার কোন অচেনা শহর নয়, হয়ত পৃথিবীটাকেও এভাবে পরিচিত করে নেয়া যাবে। যাবে জয় করা।

'যখন তুমি কিছু পাবার চেষ্টা কর, পুরো সৃষ্টি জগত ফিসফাস শুরু করে দেয় তোমাকে তা পাওয়ানোর জন্য।' বলেছিল বয়েসি রাজা।

কিন্তু সে তো ডাকাতির কথা বলেনি, বলেনি অন্তহীন মরুভূমির কথা, সেসব মানুষের কথা যারা নিজের স্বপ্নটাকে চেনে, বাস্তবে রূপ দিতে চায় না। বলেনি, পিরামিড হল নিছক পাথরের সাজানো স্তুপ। চাইলেই উঠানে বানিয়ে নেয়া যায় একটা, বলেনি, টাকা থাকলে আগেরটারচে বড় দেখে একপাল ভেড়া কেনা সম্ভব।

পাউচটা তুলে নেয় সে অবশেষে। দোকানে গিয়ে দেখে বিদেশি দুজনের সাথে আলাপে মশগুল হয়ে আছে দোকানি। দুজন ক্রেতা চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। এত সকালে এমন ভিড় সাধারণত জমে ওঠে না। যেখানে দাড়িয়ে ছিল, সেখান থেকে এই প্রথম খেয়াল করল বয়েসি সেই রাজার চুলের সাথে বুড়ো দোকানির চুলের অনেক মিল। মনে পড়ে যায় প্রথম দিন খাবার মত কিছু ছিল না যখন তখনকার চকলেটওয়ালার নির্মল হাসিটুকুর কথা। বৃদ্ধ রাজার হাসির সাথে অনেক মিল ছিল সেটারও।

যেন লোকটা এখানেই কোথাও আছে। নিজের চিহ্ন ছড়িয়ে রেখেছে সর্বত্র। কিন্তু এসব লোকের কেউ কখনো দেখেনি বয়েসি লোকটাকে। অন্যদিকে কেউ যখনি নিজের লক্ষ্য স্থির করে নিতে চায়, দেখা দেয় সেই রাজা। নানা রূপে। নানভাবে।

বিদায় না জানিয়ে চলে গেল সান্তিয়াগো। আরো লোকজনের সামনে কান্নাকাটি করতে মন সায় দিচ্ছিল না। অনেক শিখেছে। সবকিছু মিস করবে সে। মিস করবে এ জায়গাটাকে।

মনে গভীর প্রত্যয়, পুরো পৃথিবী জয় করার সাহস আছে তার।

'কিন্তু আমি ফিরে যাব সেই পুরনো মাঠগুলোয়। চড়াব সেসব ভেড়া।' কিন্তু কেন যেন সিদ্ধান্তের সাথে খুশি হতে পারছে না সে। একটা স্বপ্নকে সত্যি করার জন্য সারাটা বছর খেটে শেষে কিনা সেটাকেই সামান্য মনে হয় এখন প্রতি মুহূর্তে।

হয়ত এজন্য যে সেটা আসলে তার স্বপ্ন নয়।

কে জানে... হয়ত স্ফটিক ব্যবসায়ির মত হতে পারলেই ভাল। মক্কায় নাহয় নাই যাওয়া হল। পকেট থেকে পাথর দুটা নিয়ে সে সেই প্রথম দিনের পানশালায় যায়। দোকানি এগিয়ে দেয় এক কাপ চা।

তখনি মনে আসে আরেক ভাবনা। আমি সব সময় রাখাল হতে পারব। যা শিখেছি তা ভুলে যাবার কোন উপায় নেই। কিন্তু পিরামিড? হয়ত দেখা হবে না কোনদিনও। বুকে সোনার পাত বসানো বয়েসি লোকটা আমার অতীত জানত। সে আসলেই এক রাজা, জ্ঞানী রাজা।

আন্দালুসিয়ার প্রান্তর মাত্র দু ঘন্টার পথ, এদিকে মিসরের পথে পড়ে আছে অন্তহীন এক বালুকাবেলা। সে জানে, ব্যাপারটা অন্যরকমও হতে পারে। হয়ত মূল লক্ষ্য আর মাত্র দু ঘন্টা দূরে। এ দু ঘন্টার জন্য পুরো একটা বছর চলে গেছে, যাক না।

আমি জানি কেন ফিরে যেতে চাচ্ছি পালের কাছে, ভেড়াদের চিনি, সেটা আর কোন সমস্যা নয়; তারা ভাল বন্ধু হতে পারবে সহজেই। কিন্তু মরুভূমি? বন্ধু হতে পারবে বিশাল মরুভূমি? যদি হতে পারে, তাহলে গুপ্তধনের সন্ধানে

বেরিয়ে পড়তে পারি আমি। না পেলে বাড়ি ফেরার পথ তো খোলা। হাতে অনেক টাকা জমে গেছে, আছে প্রচুর সময়। কেন নয়?

হঠাৎ খুশির একটা ঝলক বয়ে যায় শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সে চাইলেই রাখাল হতে পারবে। পারবে স্ফটিক ব্যবসায়ী হতে। পৃথিবীতে আরো অযুত নিযুত গুপ্তধন থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু তার নিজেরটুকুর স্বপ্ন দেখিয়েছিল এক জ্ঞানী রাজা। যে সে লোক তো এমন ভাগ্য পায় না!

পানশালা ছেড়ে যাবার সময় মনে মনে হিসাব কষে নেয় সান্তিয়াগো। স্ফটিক ব্যবসায়িকে পণ্য দেয়া এক লোক ক্যারাভান নিয়ে মরুভূমি পার হয় প্রায়ই।

সময় এসেছে। উরিম আর থুমিমকে হাতে তুলে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময়।

'আমি সব সময় কাছাকাছি চলে আসি, কারণ কেউ না কেউ তার নিজের লক্ষ্যটা চেনার চেষ্টা করে।' বলেছিল বয়েসি রাজা।

সরবরাহকারীর মাল সামানের সাথে চলে গিয়ে পিরামিড আসলেই তত দূরে কিনা সেটা একটু খতিয়ে দেখতে খুব বেশি কি খরচ হয়ে যাবে?

ইংরেজ লোকটা বসে আছে বেঞ্চে। এমন এক বেঞ্চে যেটা অবস্থিত পশুর গায়ের গন্ধ, ঘাম আর ধূলাবালির এক গড়নে। খানিকটা গুদামঘরের মত, খানিকটা অন্যকিছু।

আমি কখনো ভাবিনি অবশেষে এমন কোন জায়গায় এসে ঠেকব। হাতে রাসায়নিক পত্রিকার পাতা। বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ দশটা বছর কাটিয়ে সবশেষে কিনা এখন এই গুদামঘরে!

কিন্তু তাকে এগিয়ে যেতে হবে। লক্ষণে বিশ্বাস করে সে। তার সারা জীবনের কষ্ট আর সারা জীবনের লক্ষ্য একটাই, সৃষ্টিজগতের একমাত্র সত্যিকার ভাষাটা বুঝতে শেখা। প্রথমে সমাজতত্ত্ব পড়েছিল, তারপর পড়েছে ধর্ম, অবশেষে আলকেমি। বিচিত্র কিছু ভাষা চেনে সে, জানে বেশিরভাগ বড় ধর্মের প্রায় সব রীতিনীতি। কিন্তু এখনো পুরোদস্তুর এ্যালকেমিস্ট হয়ে উঠতে পারেনি।

কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের রহস্য যে উন্মোচন করেছে এক জীবনে! তারপর শিক্ষাদিক্ষা এমন এক লক্ষ্য নিতে বলল যার বাইরে তার যাবার ক্ষমতা নেই।

সে বারবার মাথা কুটে মরেছে একজন এ্যালকেমিস্টের সাথে সম্পর্ক গড়ার জন্য। কিন্তু এই এ্যালকেমিস্ট লোকগুলোও কী আজব! তারা শুধু নিজেদের নিয়ে চিন্তা করে। প্রায় সবাই তাকে সহায়তা করবে না, সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছে। কে জানে, হয়ত আসল কাজের রহস্য ধরতে পারেনি– দ্য ফিলোসফারস স্টোনের রহস্য ধরতে পারেনি বলে বাকি জ্ঞানটুকু নিজের ভিতরেই রেখে দিতে চায় অষ্টপ্রহর।

বাবার রেখে যাওয়া বেশিরভাগ সম্পদই খুইয়ে বসেছে এতদিনে। ব্যর্থ হয়ে খুজে বেড়িয়েছে ফিলসফারস স্টোন। পৃথিবীর তাবৎ বড় লাইব্রেরিতে কাটিয়েছে অনেক অনেক সময়, কিনেছে এ্যালকেমির সবচে দামি দামি, দুর্লভ বই।

তেমনি এক বইতে পড়েছিল, সুপরিচিত এক আরব এ্যালকেমিস্ট এসেছিলেন ইউরোপে। বলা হত তার বয়স ছিল দুশ বছরেরও বেশি। বলা হত তিনি ফিলসফারস স্টোন হাসিল করেছেন। পেয়েছেন জীবনের পরশ পাথর।

ইংরেজ লোকটা এ কাহিনী পড়ে সত্যি মুগ্ধ হয়। কিন্তু তার কাছে এ শুধুই এক কাহিনী। কল্পকাহিনী। তারপর মরুভূমিতে কাজ করে আসা এক ভূতত্ত্ববিদ, তার বন্ধু, জানায় যে সত্যি সত্যি এক বয়েসি রহস্যময় ক্ষমতাধর আরব আছে।

'বাস তার আল ফাইউম মরুদ্যানে,' বলেছিল বন্ধু, 'মানুষ বলাবলি করে তার বয়স দুশ বছর। যে কোন ধাতুকে সোনায় পরিণত করতে পারে সে।'

ইংরেজ লোকটা আর উৎসাহ দমিয়ে রাখতে পারেনি। সব ওয়াদা বাতিল করে মূল্যবান আর প্রয়োজনীয় বইগুলো বেধেছেদে রওনা হয়ে যায়। আর এখন কোথায় আছে? এক ধূলিমলিন দুর্গন্ধে ভরা গুদামঘরে।বাইরে বিশাল এক ক্যারাভান তৈরি হচ্ছে। পাড়ি দিবে সাহারা। পেরিয়ে যাবে আল ফাইউম।

আমাকে সেই মরার এ্যালকেমিস্টের দেখা পেতেই হবে, ভাবে ইংরেজ লোকটা। এখন আর পশুর গায়ের গন্ধ গা গুলিয়ে দেয় না।

এক কমবয়েসি আরব উঠে এল তার পাশে।

'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?' প্রশ্ন করে তরুণ আরব।

'মরুভূমির ভিতরে যাচ্ছি।' বলেই ইংরেজ চোখ ফিরিয়ে নেয়। বই পড়তে হবে তাকে। এখন কথা বলতে মোটেও ইচ্ছা করছে না। এখন শুধু বছরের পর বছর ধরে শেখা বিষয়গুলো ঝালিয়ে নেয়ার পালা। এ্যালকেমিস্ট কি একটু বাজিয়ে দেখবে না? আলবত দেখবে।

তরুণ আরবও বের করে নেয় একটা বই। তারপর পড়তে থাকে একমনে। বইটা স্প্যানিশে লেখা। ভালই তো, ভাবে ইংরেজ। সে আরবিরচে স্প্যানিশ ভাল বলতে পারে, আর, যদি ছেলেটা আল ফাইউমে যাবার জন্য

উঠে থাকে, তাহলে আর কোন কাজ না থাকলে কথা বলার মত কাউকে পাওয়া যাবে।

'অবাক ব্যাপার,' বলল ছেলে, বইটাকে ঝোলার ভিতর কবর দিতে দিতে, 'দু বছর ধরে বই শেষ করার তালে আছি, আর কয়েক পাতার বেশি যেতেই পারি না।'

আর, যদি একজন রাজা এখানে নাক না গলাত, তাহলে সে থোড়াই পরোয়া করে এমন সব বইয়ের।

সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তার মনে এখনো কিছু তা-না-না-না আছে। একটা ব্যাপার বোঝা সহজ: সিদ্ধান্ত নেয়া আসলে কাজের শুরু মাত্র। সিদ্ধান্তটা নেয়া হয়ে গেলে লোকে আসলে তীব্র, খরস্রোতা নদীতে ঝাপিয়ে পড়ে, তারপর সে স্রোত তাকে কোথায়, কোন গন্তব্যে নিয়ে যাবে তা কেউ জানে না, সিদ্ধান্ত নেয়ার মুহূর্তে জানার প্রশ্নই ওঠে না।

প্রথমে চাইলাম গুপ্তধন খুজে বের করতে, কে জানত তখন কাজ করতে হবে স্ফটিকের দোকানে? এ বহরে ঢুকে তো গেলাম, তারপর কোথায় যাবে কে জানে!

পাশে বসে আছে এক ইংরেজ। একমনে বই পড়ছে। লোকটার খুব বেশি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নেই। সান্তিয়াগো ঢোকার সময় কী বিরক্ত হয়ে তাকিয়েছিল! তবু বন্ধুত্ব পাতানোর বাকি আশাটা ডুবিয়ে দেয় ইংরেজের একমনে বই পড়ার দৃশ্য।

বই রেখে দিয়ে ভালই করেছে সে। এ লোকের মত দেখানোর দরকার কী। উরিম আর থুমিম নিয়ে খেলা শুরু করে সে।

অবাক চোখে একটু তাকিয়েই চিৎকার করে ওঠে অপরিচিত লোকটা, 'উরিম আর থুমিম!'

এক ঝলক যেতে না যেতেই পকেটে চালান করে দেয় ছেলেটা জিনিসগুলোকে।

'বিক্রির জন্য নয়,' গম্ভীর সুরে বলে।

'খুব বেশি দামি কিছুও নয়,' পাল্টা জবাব ছোড়ে ইংরেজ, 'পাথুরে স্ফটিকের তৈরি। পৃথিবীতে অযুত নিযুত পাথুরে স্ফটিক আছে। অগুণতি। কিন্তু এসব জিনিস যে চেনে সে উরিম আর থুমিমও চিনবে। জানতাম না জিনিসগুলো পৃথিবীর এ অঞ্চলে।'

'আমাকে এক রাজা উপহার দিয়েছিলেন।'

কোন জবাব নেই অচেনা লোকটার মুখে। বরং পকেট হাতড়ে একই রকম দেখতে দুটা পাথর বের করে।

'কী বললে? রাজা?'

'জানি, ভাবছ আমার মত ছেলের সাথে রাজা কোন দুঃখে কথা বলতে যাবে! আমিতো রাখাল ছেলে!'

'না, না। এক রাজাকে প্রথম দেখতে পায় রাখাল ছেলেরাই। বাকি দুনিয়া যখন তাকে অস্বীকার করে তখনো। তাই এ কথা বলার যো নেই যে রাজারা কশ্মিন কালেও রাখালদের সাথে কথা বলবে না।'

তার কথা থামে না, কে জানে, ছেলে হয়ত মর্ম ধরতে পারবে না, 'বাইবেলে লেখা আছে। এ বইতেই প্রথম উরিম আর থুমিমের ব্যাপারে জানতে পারি। ঈশ্বর শুধু এ রূপগুলোকেই ঐশ্বরিক হিসাবে মর্যাদা দিয়েছিলেন। যাজকরা সোনার বুক-পাতে রেখেছিল পাথরগুলোকে।'

হঠাৎ এখানে, বদ্ধ গুদামঘরে থাকার ব্যাপারটা ভাল লাগতে শুরু করে ছেলেটার।

'কে জানে, হয়ত এটা কোন লক্ষণ।' প্রায় চিৎকার করে ওঠে ইংরেজ।

'লক্ষণের ব্যাপারে কে বলেছিল তোমাকে?'

'জীবনের প্রতিটা ব্যাপারই কোন না কোন লক্ষণ।' হাতের বৈজ্ঞানিক পত্রিকাটা বন্ধ করতে করতে বলে ইংরেজ লোকটা।

'একটা মহাজাগতিক ভাষা আছে, যে ভাষা সবাই বোঝে, কিন্তু ভুলে গেছে। আমি সেই মহাজাগতিক ভাষার সন্ধানে বেরিয়েছি। বেরিয়েছি আরো কিছু ব্যাপারের খোজে। এজন্যই আসা। এ মহাজাগতিক ভাষার ব্যাপারে জানে এমন কাউকে খুজতে এলাম। এলাম একজন এ্যালকেমিস্টকে খুজতে।'

বাইরে আওয়াজ উঠলে কথা থেমে যায়।

এক ইয়া মোটা আরব বলে ওঠে, 'তোমাদের কপাল ভাল। দুজনেরই। আজ বহর ছেড়ে যাচ্ছে আল ফাইউমের দিকে।'

'কিন্তু, আমিতো মিশরে যাব।'

'আল ফাইউম মিশরেই।' বিরক্ত হয় আরব, 'তুমি আবার কোন ধারার আরব, মিয়া?'

'এটা সৌভাগ্যের লক্ষণ।' মোটা আরব চলে যেতেই বলে ওঠে ইংরেজ, 'সময় সুযোগ পেলে ভাগ্য আর হঠাৎ ঘটা ব্যাপার নিয়ে রীতিমত বিশ্বকোষ লিখে বসতাম। সে ভাষায়। যেসব শব্দে মহাজাগতিক ভাষা লেখা হয়েছিল এককালে, সেসব শব্দে।'

লোকটা আরো খোলাসা করে জানায় যে উরিম আর থুমিম নিয়ে তার সাথে দেখা হওয়াটা মোটেও কাকতালীয় নয়। বরং সে এ্যালকেমিস্টের সন্ধানে এসেছে কিনা তা জানতে চায় সে।

'আমি গুপ্তধনের সন্ধানে বেরিয়েছি,' বলেই মনে মনে পস্তানো শুরু করে ছেলেটা।

কিন্তু বিচিত্র ইংরেজের যেন এসব বিষয়ে কোন মাথাব্যথাই নেই।

'অন্য অর্থে, আমিও।'

'আমিতো ছাই জানিও না এ্যালকেমি ব্যাপারটা কী,' মাত্র বলা শুরু করেছে সান্তিয়াগো এমন সময় গুদামঘরের লোকটা তাদের ডেকে নিল। বাইরে।

'বহরের নেতা আমি,' কালো চোখের দাড়িওয়ালা এক লোক বলে, 'আমার সাথে যাওয়া সব মানুষের জীবন আর মরণ নির্ভর করে আমার উপর। মরুভূমি হল উর্বশী এক নারী যে মাঝে মাঝে পাগল বানিয়ে ছাড়ে পুরুষদের।'

প্রায় শ দুয়েক লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। আর শ চারেক জন্তু জানোয়ার। উট আছে। আছে ঘোড়া, গাধা, দুম্বা। মহিলা আছে, আছে অনেক বাচ্চা আর বাকিরা পুরুষ। কোমরের খাপে তলোয়ার, কাধ থেকে বন্দুক ঝুলছে। ভাল কলরব উঠল চারধারে। দাড়িওয়ালা লোকটা কথাগুলো সবাইকে বারবার শোনায়।

'জাত বিজাতের মানুষ আছে এখানে। একেকজনের দেবতা একেকজন, কারো ঈশ্বরের সাথে কারোটা নাও মিলতে পারে। কিন্তু আমি মাত্র এক ঈশ্বরের সেবা করি আর তিনি আল্লাহ। আল্লাহর নামে শুরু করছি, জানিয়ে দিচ্ছি, মরুর বুকে জিতে যাবার সব ধরনের চেষ্টা করব আমার তরফ থেকে। কিন্তু আপনাদের সবাইকে ঈশ্বরের নাম নিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে আমার সব কথা মানার চেষ্টা করবেন। যা-ই বলি না কেন, সব। মরুর বুকে অবাধ্যতার আরেক নাম আছে। মরণ।'

গুঞ্জন ওঠে সবার মধ্যে। সবাই যার যার ঈশ্বরের কাছে ওয়াদা করছে। নিরবে। ছেলেটা যিশুর কাছে প্রতিজ্ঞা করে। চুপ করে থাকে ইংরেজ। পুরো আওয়াজ মিলিয়ে যায় *ওয়াও!* বলতে যত সময় লাগে তারচে একটু বেশি সময় পর। স্বর্গের কাছে নিরাপত্তা চায় কমবেশি সবাই।

তারপর সবার একই সাথে উঠে দাড়ানোর পালা। সান্তিয়াগো আর নাম না জানা ইংরেজের উট আছে। অনিশ্চয়তা মনে নিয়ে উঠে পড়ে তারা জন্তুগুলোর পিঠে। বইয়ের ভারে ইংরেজ লোকটার উট বেচারা রীতিমত ভারাক্রান্ত।

'কাকতালের মত বেশ কিছু ব্যাপার আছে,' বলল ইংরেজ লোকটা, কথা যেখানে ফুরিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে শুরু করছে সে, 'আমি এসেছি অন্য কারণে। এক বন্ধু বলল বয়স্ক আরবের কথা, যে কিনা...'

চলতে শুরু করেছে ক্যারাভান। এখন আর ইংরেজের কথা শোনা যায় না।

সান্তিয়াগোর মনে অন্য ভাবনা। রহস্যময় এক শিকল সবাইকে বেধে রাখে অষ্টেপৃষ্ঠে। সে শিকলই টেনে নেয় তাকে আফ্রিকার কাছাকাছি এক শহরে, সেখানে দেখা হয় অবাক করা রাজার সাথে, বাবার দেয়া টাকাকড়ির মাধ্যমে পাওয়া ভেড়ার পাল বিকিয়ে দেয় সে, তারপর চলে আসে আরেক মহাদেশে, সেখানে ডাকাতি হয় সব পয়সা, কাজ করে স্ফটিকের দোকানে, তারপর এখন, যাত্রা শুরু করে...

লোকে লক্ষ্যের যত কাছে চলে আসে ততই লক্ষ্যটা তার জন্য বড় হয়ে দেখা দেয়, ভাবে ছেলেটা।

পূবে চলছে ক্যারাভান। সকালে চলা শুরু হয়, সূর্যটা মাথার উপর এলে থামে, বিকালে আবার চলা।

ইংরেজ লোকটার সাথে খুব বেশি কথা হয়নি সান্তিয়াগোর। লোকটা তো বেশিরভাগ সময় বইতে মুখ গুজে থাকে।

কত বদলে গেছে পরিবেশ! এখন মৃদু তালে মিছিলের মত এগিয়ে যাচ্ছে তাদের বহর। বণিকেরা তীব্র ভাষায় নিয়ন্ত্রণ করে জন্তুগুলোকে, চাকরদের। গাইডরাও হন্যে হয়ে যায় সবাইকে ঠিক রাখতে গিয়ে।

কিন্তু মরুভূমির বুকে একটা শব্দই চিরকালের। বাতাসের হু হু শব্দ। এমনকি গাইডরাও পারতপক্ষে একে অন্যের সাথে কথা বলে না।

'এ বালুময় প্রান্তর পার হয়েছি অনেকবার,' একরাতে বলে উঠল এক উটচালক, 'কিন্তু মরুভূমি এত বড় আর দিগন্ত এত দূরে যে মানুষের নিজেকে নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে হয়। তাই চুপ করে থাকা ছাড়া গতি থাকে না।'

বোঝে সান্তিয়াগো, কখনো সমুদ্র দেখলে বা বনে আগুন লাগলে এমনি মনে হয়। প্রাকৃতিক শক্তির সামনে কথা বেরুতে চায় না মুখ দিয়ে।

আমি ভেড়াদের কাছে শিখেছি, শিখেছি স্ফটিকের কাছ থেকে। এখন মরুর কাছ থেকে শেখার পালা। অনেক বয়েসি আর জ্ঞানী মনে হয় মরুভূমিকে।

থামতেই চায় না বাতাস। মনে পড়ে যায় ছেলেটার, তারিফায় পা রাখার দিন কেল্লার উপর এমন বাতাস টের পেয়েছিল। মনে পড়ে যায় ভেড়াগুলোর পশমের কথা, মনে পড়ে, তারা এখনো সেই আন্দালুসিয়ার প্রান্তরে ঘাস-পানির জন্য ঘুরছে।

'এগুলো আর আমার ভেড়া নয়,' স্মৃতিকাতরতা ছাড়িয়ে নিজেকে শোনায় সান্তিয়াগো, 'নতুন রাখালদের সাথে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এ্যাদ্দিনে। কে জানে, ভুলেও গেছে হয়ত। ভাল। ঘুরে বেড়ানো প্রাণিগুলো ঘুরে বেড়াতে জানে।'

মনে পড়ে যায় সেই পুরনো বণিকের মেয়ের কথা। এতদিনে বিয়ে হয়ে গেছে না তার? কোন রুটিওয়ালার সাথে? নাকি কোন গল্প বলিয়ে, পড়তে জানা রাখালের সাথে? হতেই পারে। সে ছাড়া এমন আরো রাখাল থাকতে পারে। তারা হয়ত তার মতই মহাজাগতিক ভাষার ব্যাপার একটু আধটু বুঝতে পারে।

'হাঞ্চ' বলত মা সেসব মানুষকে। তারা এক সুতায় গাথা অতীত আর ভবিষ্যতের কথা বলতে জানে। কারণ কোথাও না কোথাও লেখা আছে সব ব্যাপার।

'মাকতুব' বলে ছেলেটা, বণিকের কথা মনে পড়ার সাথে সাথে।

মরুভূমিতে বালি আর বালি। কোথাও কোথাও পাথুরে এলাকা। এসব জায়গা সাবধানে এড়িয়ে যেতে হবে। পশুর ক্ষতি, পথ চলা মানুষেরও ক্ষতি। কোথাও দেখা যায় শুকনো হ্রদ। দেখা যায় হ্রদের তলায় জমে থাকা লবণের দেখা।

কখনো মারা যায় উট, মারা যেতে পারে উটচালক বা কোন যাত্রি। যাই হোক না কেন, অন্যে সে জায়গা নিয়ে নিবে। অন্তত মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে।

এসবের একটাই কারণ। পথচলা থেমে থাকবে না। ভ্রান্ত হবে না। মরুদ্যান দেখানো তারাগুলোর দিকে চলতে হয়। এসব সামনে আছে পাম গাছের ছায়া। খেজুরের ছায়া। পানি। খাবার। আর আছে মানুষ।

এতসব বিষয়ে শুধু একজনের কোন নজর নেই। ইংরেজ লোকটার। সে সারাক্ষণ বইতে মুখ গুজে থাকবে।

প্রথম দু একদিন সান্তিয়াগোও চেষ্টা করেছে বই পড়ার। পরে মনে হল ক্যারাভান চলতে থাকা, চারপাশে তাকিয়ে দেখা, এসবেই আসল আনন্দ। উটদের সাথে বন্ধুত্ব পাতালে মন্দ হয় না।

পাশে পাশে চলতে থাকা এক উটচালকের সাথে বন্ধুত্ব হয় তার। একজন উটচালক, আরেকজন ভেড়ার পাল চালাত।

রাতের পর রাত তারা আগুনের পাশে বসে কিছুক্ষণের জন্য। তারপর নানা কথা হয়। একদিন উটওয়ালা ছেলেটা তার কাহিনী বলল।

'আমি আগে আল কারিয়ামের কাছে থাকতাম। ছেলেপুলে ছিল, ছিল আয়ের উৎস। জীবনটা একভাবেই কেটে যেতে পারত। এক বছর দারুণ ফসল ফলে, আমরা সবাই মিলে মক্কা চলে যাই। জীবনের না পাওয়া একমাত্র আশাটাও পূর্ণ হয়। খুশিমনে মরতে পারব ভাবতেই ভাল লাগত।

'একদিন কেপে উঠল গোটা পৃথিবী। ভেসে গেল নীলের দু কূল। সব সময় মনে হত, এসব অন্য কারো কপালে ঘটবে, আমার জীবন চলবে যেমন চলছে। প্রতিবেশীরা ভয়ে অস্থির। এবারের বন্যায় মরে যাবে সব ফলগাছ। স্ত্রী ভয় পায়, ছেলেমেয়ে মারা যেতে পারে। আমার ভয় আমার সবকিছু নিয়েই।

'একেবারে শেষ হয়ে গেছে সব জমিজমা। আমাকে অন্য কাজ খুজতে হবে এবার। তাই আমি এখন উটওয়ালা। কিন্তু ঐ দুর্ঘটনা আমাকে আল্লাহর ভুবনগুলো চিনতে শেখায়। অচেনাকে ভয় পাবার কিছু নেই যদি তুমি নিজের চাওয়া ও পাওয়াটুকু বুঝতে পার।

'আমরা আমাদের যা আছে তা হারানোর ভয়ে কাতর হয়ে থাকি, আবার ভেবে খুব তুচ্ছ মনে হয় যে আমাদের জীবনের ইতিহাস আর এ পৃথিবীর ইতিহাস এক সূত্রে গাথা। এক হাতে গড়া।'

মাঝে মাঝে এক ক্যারাভানের সাথে আরেকটার দেখা হয়ে যায়। সবগুলোতেই বিনিময়ের মত কিছু না কিছু থাকবে। যেন সত্যি সত্যি সব এক হাতে লেখা। চোর আর বর্বর উপজাতির ব্যাপারে আসে সাবধানবাণী। তারা কালো পোশাকে নিঃশব্দে আসে। তারপর চলেও যায় একই ভাবে। চোখ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

এক রাতে সান্তিয়াগো আর ইংরেজ লোকটার বসার জায়গায় এগিয়ে আসে এক উটচালক।

'গোত্রে গোত্রে যুদ্ধের গুজব ছড়িয়ে পড়েছে।' জানায় সে।

চুপ করে যায় তারা। বাকি সবাই কেমন যেন নিশ্চুপ। কেউ কিছু বলছে না। আবার শব্দহীন ভাষার কথা মনে পড়ে যায় তার। মহাজাগতিক ভাষা।

বিপদ আছে কিনা জিজ্ঞেস করে ইংরেজ।

'একবার মরুভূমিতে ঢুকে পড়লে আর কোন উপায় নেই,' বলল উটচালক, 'আর ফিরে যাবার কোন উপায় যেহেতু নেই, তোমাকে ভাবতে হবে কী করে সামনে চলা যায় সে কথা। বাকিটা আল্লাহর হাতে। বিপদও।'

তারপর সে সেই রহস্যময় শব্দ উচ্চারণ করে কথা শেষ করে, 'মাকতুব।'

'তোমার বরং ক্যারাভানের দিকে আরেকটু নজর দেয়া উচিত।' ইংরেজ লোকটাকে বলে সান্তিয়াগো। 'আমরা অনেক ঝক্কি ঝামেলা পোহাই, তার পরও, চলি একই গন্তব্যে।'

'আর তোমার আরো পড়া উচিত। বই হল ক্যারাভানের মত জিনিস। সব সময় এক লক্ষ্যে ধাবিত হয়।'

বেড়ে গেল চলার গতি। সারাদিন তীব্র গতিতে চলা, তারপর রাতে আগুনের পাশে একত্র হওয়া। আগে যাও একটু আধটু কথা চালাচালি হত, এখন তাও বন্ধ হয়ে গেছে।

এক রাতে শমন জারি করল ক্যারাভানের পরিচালক, আগুন জ্বালানো যাবে না। দূর থেকে যেন ক্যারাভানের অস্তিত্ব বোঝা না যায়।

সবাই রাতে পশুর দলকে গোল করে শোয়ায়, তারপর মাঝখানে শুয়ে পড়ে নিজেরা। ঠান্ডার হাত থেকে বাচার জন্য। না চাওয়া বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য। এদিকে ক্যারাভানের দলনেতা লোকটাও সারা রাত পাহারাদার বসিয়ে রাখে।

এক রাতে ঘুমাতে পারছিল না ইংরেজ। আকাশে পূর্ণ চাদ। দু একজন ছাড়া সবাই ঘুমে কাতর। নিজের জীবনের কাহিনী বলে শোনায় সান্তিয়াগো।

ইংরেজ লোকটা স্ফটিক দোকানের কথায় অবাক হয়।

'এই হল আমাদের সব আত্মা চালানোর রীতি। একেই বলে এ্যালকেমি। পৃথিবীর আত্মা। কায়মনোবাক্যে কিছু চাইলেই শুধু জগতের আত্মার কাছে যাওয়া যাবে। শক্তিটা সব সময় সহায়তাপূর্ণ।

'পৃথিবীর বুকে এই যে মানুষ, পশু, এমনকি শাক-সব্জির আত্মা যেমন আছে, তেমনি আছে ভাবনার হৃদয়। আমরা সে আত্মার অংশ বলেই এর অস্তিত্ব ঠিক ধরতে পারি না। স্ফটিকের দোকানে কাজ করার সময় তুমি হয়ত টের পেয়েছ যে টুকরাগুলোও সহায়তা করছে তোমাকে।'

একটু ভাবে সান্তিয়াগো। তারপর চোখ তুলে বলে, 'মরুভূমি পেরিয়ে যাবার পথে আমি একমনে ক্যারাভান দেখেছি। ক্যারাভান আর মরু– দুজনেই এক ভাষায় কথা বলে। নাহলে মরুভূমি তাকে পেরিয়ে যাবার অনুমতি দিত না। প্রতি মুহূর্তে ক্যারাভান সময়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। যদি সময় হয়ে থাকে, আমরা এগিয়ে যাব সামনে। মরুদ্যানের দিকে।'

'যদি কেউ এ ক্যারাভানে শুধু ব্যক্তিগত সাহস নিয়ে যোগ দিয়ে থাকে তো এ যাত্রা কতটা কষ্টের হবে সেটাও তাদের জানা থাকা দরকার।'

চাঁদের দিকে তাকিয়ে তারা দাঁড়িয়ে থাকে।

'এ হল লক্ষণের জাদু। আমি খেয়াল করেছি কী করে গাইডরা লক্ষণ বিচার করে, কী করে কথা বলে মরুর হৃদয়ের সাথে।'

ইংরেজ লোকটা বলল, 'আমার তাহলে ক্যারাভানের দিকে আরো নজর দেয়া দরকার।'

'আর আমার চেখে দেখা দরকার তোমার বইগুলো।'

বইগুলো আসলেই আজব ধরনের। সেখানে পারদের কথা আছে, আছে লবণের কথা। একই সাথে আছে ড্রাগন আর রাজাদের কথাও। সে সবটুকু বুঝে উঠতে পারে না। বইতে শুধু একটা ধারণা ভালভাবে দেয়া আছে। তা হল, সব আসলে এক শক্তিতে গঠিত।

আরেক বই দেখে জানতে পারল, এ্যালকেমির সাহিত্যে মাত্র কয়েকটা বাক্যের রাজত্ব।

'এ হল এ্যামারল্ড ট্যাবলেট।' সান্তিয়াগোকে কিছু শিখানোর ইচ্ছা আছে তার।

'তাহলে আর এত বইয়ের দরকার কী?'

'যেন আমরা ঐ সামান্য কয়েক ছত্র বুঝে উঠতে পারি।'

বিখ্যাত এ্যালকেমিস্টের কথা বলা আছে যে বইতে, সেটাই তাকে সবচে বেশি টানে। এ মানুষগুলো অদ্ভুত। ল্যাবরেটরিতে ধাতুর শুদ্ধতা নিয়ে তাদের পুরো জীবন উৎসর্গ করে দেয়। তারা বিশ্বাস করে যে একটা ধাতুকে অনেক বছর ধরে তাপ দিলে সে তার নিজের সমস্ত গুণ ছেড়ে যাবে, তখন যা বাকি থাকে তাই হল জগতের আত্মা। জগতের এই আত্মাই জগতের যে কোন ব্যাপার বুঝতে তাদের সহায়তা করে।

এ আবিষ্কারকে তারা আসল কাজ নাম দেয়। আংশিক তরল আর আংশিক কঠিন।

'ভাষাটা বোঝার জন্য তুমি কি শুধু মানুষ আর লক্ষণের দিকে তাকিয়ে থাকতে পার না?' একদিন ধুম করে প্রশ্ন ছুড়ে দেয় সান্তিয়াগো।

'সবকিছু সরল করে ফেলার একটা রোগ ধরে গেছে তোমার। এ্যালকেমি খুব স্থির একটা বিষয়। খুব সিরিয়াস। আসল কর্তারা যেভাবে করে গেছেন সেভাবে প্রতিটা ধাপ মেনে চলতে হবে।'

সে জানতে পারে, আসল কর্তাদের করা কাজের তরল অংশটুকু হল জীবনের অমৃত। সব রোগ সারিয়ে দিতে পারে এটা। এ্যালকেমিস্টরা এসব ব্যবহার করেই মারা যাওয়া ঠেকিয়ে রাখে। আর কঠিন অংশটার নাম ফিলোসফারস স্টোন।

'ফিলোসফারস স্টোন পাওয়া কিন্তু মুখের কথা না। এ্যালকেমিস্টরা ল্যাবরেটরিতে বছরের পর বছর সময় ব্যয় করেছে, চোখ রেখেছে আগুনের প্রতি, ধাতুর প্রতি। আগুনের কাছে এত বেশি সময় কাটিয়েছে যে আস্তে আস্তে

তাদের ছেড়ে দিতে হয় দুনিয়া, সব ধরনের রীতিরেওয়াজ। ধাতুর শুদ্ধতা আসলে তাদের শুদ্ধতা হয়ে যায়।'

স্ফটিক দোকানি বলেছিল, এসব জিনিস পরিষ্কার করাটা ভাল, তাতে সান্তিয়াগোর মনে না বোধক চিন্তা আসতে পারবে না। আসলে মানুষ নিত্যদিনের কাজে এ্যালকেমির খোজ পেতে পারে।

'এদিকে ফিলোসফারস স্টোনের বিচিত্র কিছু কেরামতি আছে। সামান্য একটু রূপাকে অনেক বেশি সোনায় পরিণত করা যায়। স্পর্শ করলেই।'

এসব শুনে শুনে তার মনে স্বপ্ন জাগে, একদিন সেও কাজ করে দেখাবে। স্পর্শ দিয়ে হয়ত সেও আর সব ধাতুকে বানাবে স্বর্ণ। হ্যলভেশিয়াস, ইলিয়াস, ফুলকেনেলি আর জিবারের মত। তাদের সবাই জীবন কাটিয়েছেন ভ্রমণ করে, কথা বলেছেন জ্ঞানীদের সাথে, অর্জন করেছেন বিচিত্র সব অলৌকিক শক্তি আর সেইসাথে ছিল পরশপাথর বা ফিলোসফারস স্টোন আর জীবনামৃত।

আসল কাজ কীভাবে অর্জন করতে হয় দেখা লাগবে সান্তিয়াগোর। সে তাকায় বইতে। আর হতাশ হয় গ্রাফ, চার্ট, অঙ্ক আর টেকনিক্যাল কথাবার্তা দেখে।

'এরা এত জটিল জিনিস বানায় কেন?' একরাতে সান্তিয়াগো জিজ্ঞেস করে ইংরেজকে।

'যেন যাদের বোঝার দায় পড়েছে তারা বুঝে নেয়, একবার দেখ, সবাই যদি পারদকে স্বর্ণ করতে জানে তাহলে স্বর্ণের দামটা থাকবে কোথায়?

'কিন্তু শুধু কাগজে কলমে কাজ করলে হবে না, অনেক জানলেও হবে না, হলে আমি চলে আসতাম না এখানে, এ মরুভূমির মধ্যে। একজন সত্যিকার এ্যালকেমিস্টের খোজে আছি যে কোডগুলো ভেঙে দিবে।'

'কখন লেখা হয় বইগুলো?'

'অনেক শতক আগে।'

'তখনকার দিনে ছাপাখানা ছিল না,' যুক্তি দেখায় ছেলেটা, 'সবাই যে এ্যালকেমি জানতে পারবে সে আশাতেও গুড়ে বালি। তাহলে কেন শুধু শুধু এত জটিল সব আকাআকি আর অঙ্ক করেছে?'

সরাসরি জবাব দেয় না ইংরেজ। গত কয়েকদিন ধরে সে ক্যারাভান চালানোর রীতিনীতি দেখছে। কিন্তু শিখতে পারেনি নতুন কোনকিছু। শুধু যুদ্ধের কথায় কীভাবে সাবধান হতে হয় সেটাই শিখে নেয়ার বিষয়।

বইটা ইংরেজের কাছে জমা দিতে গেল সান্তিয়াগো।

'শিখেছ নাকি কিছু?'

ইংরেজ আসলে যুদ্ধের কথায় অস্থির বোধ করছে। তার মনে হয় এ্যালকেমির মত মজার বিষয় নিয়ে কথা বললে মনের অস্থিরতা দূর হবে।

ছেলেটা বলল, 'দুনিয়ার একটা আত্মা আছে, যে আত্মা চিনতে পারে, সে বিভিন্ন বিষয়ের ভাষাও চিনতে পারবে। শিখলাম, অনেক এ্যালকেমিস্ট তাদের জীবনের লক্ষ্যটা অর্জন করে ফিলোসফারস স্টোন আর জীবনের অমৃত নিয়ে।

'কিন্তু, সবচে বড় কথা হল, এ কথাগুলো এত সরল যে লিখে ফেলা যায় একটা এ্যামারাল্ডের উপর।'

হতাশ হয় ইংরেজ লোকটা। সারা জীবনের হাড়ভাঙা ল্যাবরেটরির কাজ, শিক্ষা ও গবেষণার প্রণালী, নতুন নতুন প্রযুক্তি– কিছুই রাখাল ছেলেটার উপর প্রভাব ফেলতে পারে না, হয়ত এজন্য যে তার আত্মা একেবারে আদ্যিকালের।

বই নিয়ে সে ব্যাগে পুরে ফেলে।

'তুমি বরং ক্যারাভান দেখতে ফিরে যাও, আমি এসব দেখে কিস্যু শিখতে পারিনি।'

ফিরে যায় ছেলেটা। তারপর নিজেকে শোনায়, 'সবারই নিজের নিজের শিখে নেয়ার পদ্ধতি আছে। আমারটার সাথে তারটা মিলবে না। কিন্তু দুজনেই জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য বেরিয়েছি। শ্রদ্ধা করি তাকে।'

রাতদিন চলবে ক্যারাভান এখন থেকে। হুড পরা বেদুইনরা যখন তখন দেখা দেয়। উটচালক বন্ধু এগিয়ে এসে জানায়, গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ক্যারাভানের কপাল খুব ভাল থাকলে মরুদ্যানে পৌছতে পারবে।

প্রাণিগুলো মুষড়ে পড়ে, মানুষে মানুষে কথা বলা কমে যায়। রাতে উটের গরগর আওয়াজে সবার পিলে চমকে ওঠে। কে জানে, আক্রমণ হয়ে গেল কিনা!

এসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই উটওয়ালার।

'বেচে আছি আমি। খাবার সময় সে কথাটাই ভাবি শুধু। পথচলার সময় পথের কথা আর যদি যুদ্ধ বেধে যায়, আর কারোচে কম লড়ব না।

'যেহেতু আমার নির্ভরতা নেই অতীত-ভবিষ্যতের উপর, শুধু বর্তমান নিয়ে বাচতে চাই। বর্তমানে যত মনোযোগ দিবে তত সুখি হবে তুমি। দেখো, মরুর বুকেও প্রাণ আছে। আকাশে আছে তারার দল। গোত্রগুলো লড়ে যায় কারণ তারা মানুষ। জীবন আসলে তোমার কাছে এক চমৎকার পার্টি। যেখানে আছ, সেখানে টিকে থাকাই হল জীবন।'

এক রাতে, যে তারা দেখে দেখে তারা এগিয়ে যেত সেদিকে তাকায় সান্তিয়াগো। তারপর বুঝতে পারে, কেন যেন দিগন্ত উঠে এসেছে। নাকি নেমে এসেছে তারার দল? না, সামনেই মরুদ্যান।

'মরুদ্যান!' বলে ওঠে উটচালক।

'চল এখনি যাই! যাচ্ছি না কেন আমরা?'

'কারণ, ঘুমাতে হবে।'

সূর্য ওঠার সাথে সাথে জেগে উঠল ছেলেটা। যেখানে ছিল রাতের তারা, সেখানে এখন দিগন্ত বিস্তৃত সারি সারি খেজুর গাছ।

আগেই জেগে ওঠা ইংরেজ কথা বলে ওঠে খুশির সুরে, 'পেরেছি! আমরা পেরেছি!'

চুপ করে থাকে সান্তিয়াগো। তার লক্ষ্য এখনো দূরে। পিরামিড এখনো দূরে। কিন্তু আজ সকাল, দিগন্ত ছোয়া খেজুর গাছের সারি, সব রয়ে যাবে স্মৃতিতে। মানুষের বাস বর্তমানে, ভবিষ্যতের স্বপ্নে।

কাল একটা উটের আওয়াজ পেয়ে সবাই ভড়কে গিয়েছিল, আজ খেজুর গাছ শোনায় আশ্বাসের বাণী।

পৃথিবীর ভাষা আসলে অনেক ধরনের।

সময় বয়ে যায়, আর বয়ে যায় ক্যারাভান, ভাবে এ্যালকেমিস্ট। লোকজন চিৎকার চেচামেচি করছে, উড়ছে মরুর বালি, বাচ্চারা নতুন মানুষ দেখে

উৎসাহে টগবগ করছে। দেখল, উপজাতিয় নেতারা ক্যারাভানের নেতার সাথে কথা বলছে অনেক সময় ধরে।

কিন্তু এসবে এ্যালকেমিস্টের কিস্যু এসে যায় না। সে অনেক ক্যারাভান আসতে যেতে দেখেছে, দেখেছে মরুর বুকে রাজা আর ভিখারিকে হাটতে, ধূ ধূ প্রান্তর যেমন ছিল থেকে গেছে ঠিক তেমনি।

সে ছেলেবেলা থেকে একটা ব্যাপার দেখে দেখে অভ্যস্ত। ভ্রমণ করতে আসা লোকজন সপ্তাহের পর সপ্তাহ মরুভূমিতে হলুদ বালি আর নীল আকাশ দেখে দেখে হঠাৎ সবুজ খেজুরের সারি দেখলে পাগলের মত হয়ে যায়।

কে জানে, মানুষ যাতে গাছের মূল্য দেয় এজন্যই হয়ত ঈশ্বর মরুভূমি সৃষ্টি করেছেন।

তাকে আরো বাস্তব কিছু ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করতে হবে। এখানে, এ বহরে আছে এক লোক যাকে কিছু শিখাতে হতে পারে। লক্ষণগুলো এমনি বলে। সে এখনো দেখেনি লোকটাকে, কিন্তু অভ্যস্ত চোখ এক মুহূর্তে চিনে ফেলে।

তার একটাই আশা, আগের শিক্ষার্থীর মত যোগ্য যাতে হয়।

জানি না এসব কথা মুখের ভাষায় বদলে নেয়ার দরকারটা কী? ঈশ্বর তার সব সৃষ্টিতে এসব রহস্য রেখেছে।

তবু, এসব জ্ঞানকে কথায় রূপান্তর করার কারণ অন্য। মানুষের জন্য। সবাই মহাজাগতিক ভাষা পারে না।

ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস হয় না সান্তিয়াগোর। তার মনে হয়েছিল মরুদ্যান জিনিসটা আসলে সামান্য কিছু খেজুর গাছের সারি– ভূগোল বইতে যেমন দেখেছিল তেমন– কিন্তু আসলে স্পেনের অনেক শহরেরচে বড় এ জায়গাটা। কুয়া আছে তিনশ। আছে পঞ্চাশ্ হাজার খেজুর গাছ। আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে রঙ বেরঙের হাজারো তাবু।

'দেখে আরব্যরজনীর কথা মনে পড়ে যায়, তাই না?' প্রশ্ন তোলে ইংরেজ লোকটা। এ্যালকেমিস্টের সাথে দেখা করার জন্য উতলা হয়ে আছে।

বাচ্চারা ঘিরে আছে তাদের। পুরুষরা জানতে চায় যুদ্ধের ব্যাপারে আর মহিলারা নিয়ে আসা রত্ন দেখতে ব্যস্ত।

মরুর নিরবতা থেমে গেছে। একসাথে সবাই গোলমাল পাকাতে শুরু করে। যেন জীবন ফিরে এসেছে এখন, তারা চলে এসেছে আত্মার জগত থেকে মানুষের জগতে।

অনেকে ভয়ে ভয়ে ছিল। তখন বাকিরা জানায়, যুদ্ধের জন্য মরুদ্যান খারাপ জায়গা নয়, সাহারার বুকে মরুদ্যান অনেক আছে। কিন্তু এগুলোয় বাস করে মূলত শিশু আর নারীরা। তাই যুদ্ধ হয় মরুভূমির বুকে।

বহরের নেতা সবাইকে কোনক্রমে জড়ো করে জানাল যে যুদ্ধ থামা পর্যন্ত তারা এখানেই অপেক্ষা করবে। তারপর জানাল, আরবের রীতি অনুযায়ী, সবাই থাকবে এখানে। এখানকার মানুষের বাসায় আতিথেয়তা নিবে।

কিন্তু সশস্ত্র লোক আর তার পাহারাদারদের তুলে দিল গোত্রপতির হাতে।

'এই হল যুদ্ধের নিয়ম,' বলল সে, 'যোদ্ধারা যুদ্ধের সময় মরুদ্যানে থাকতে পারবে না।'

অবাক করে দিয়ে একটা কোল্ট রিভলভার বের করে ইংরেজ। তারপর তুলে দেয় গোত্রপতিদের হাতে।

'রিভলভার কেন?'

'এটা মানুষের উপর বিশ্বাস আনতে সাহায্য করে আমাকে।'

এখন সান্তিয়াগোর মনে পড়ে যায় গুপ্তধনের কথা। যত কাছে যাচ্ছে ততই কঠিন হয়ে উঠছে যেন। যে শুরু করে তার ভাল ভাগ্যের ব্যাপারটা আর নেই।

পথে পথে আছে লক্ষণ। ঈশ্বর আমার জন্য পাঠিয়েছে। হঠাত তার মনে হয় আসলে লক্ষণগুলো পার্থিব বিষয়। খাওয়া ঘুমানোর মত নিত্যদিনের ব্যাপার।

'ধৈর্য হারিও না,' নিজেকে শোনায় সান্তিয়াগো। সেই উট চালকের কথাই যেন সত্যি, 'খাবার সময় খাও, চলার সময় এগিয়ে চল।'

প্রথমদিন সবাই পাড় মাতালের মত পড়ে পড়ে ঘুমায়। প্রায় সমবয়সি আরো পাঁচজনের সাথে ছেলেটা আর তার উটওয়ালা বন্ধু শুয়েছে।

সে তাদের শোনায় জীবনের কথা। কী করে রাখাল হল, স্ফটিকের দোকানদার হল, তারপর বলল ইংরেজ লোকটার কথা।

চলে এল ইংরেজ একটু পরই, 'তুমি এখানে! আর আমার অবস্থা খারাপ। আচ্ছা, একটু সহায়তা কর। এ্যালকেমিস্ট কোথায় থাকে খুজে বের করতে হবে।'

তারা নিজেরাই বের করবে, ঠিক করে নেয়। মরুদ্যানের আর দশজনের মত করে একজন এ্যালকেমিস্ট বাস করবে তা তো হবে না। হয় তার তাবু হবে গোল, নাহয় অষ্টপ্রহর সেখানে আগুন জ্বলবে।

সবখানে খোজার পর একটা সিদ্ধান্তে আসে তারা। মরুদ্যানটা অনেক বেশি বড়। হাজার তাবু আছে এখানে।

'সারাটা দিন মাটি হয়ে গেল,' কুয়ার পাশে বসে বলতে থাকে ইংরেজ।

'তারচে চল কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখি।'

কিন্তু ইংরেজ এখানে আসার কারণ জানাতে চায় না কাউকে। সব ভেস্তে যেতে পারে। পরে সিদ্ধান্ত পাল্টায় সে।

ছাগলের চামড়ায় পানি নিতে আসা এক মহিলাকে প্রশ্ন করে শুরু করবে সান্তিয়াগো।

'শুভসন্ধ্যা, ম্যাডাম। আমি এ মরুদ্যানের এ্যালকেমিস্টকে খুজে বের করার চেষ্টা করছি।'

মহিলা কশ্মিনকালেও এমনধারা শব্দ শোনেনি জানিয়ে চট জলদি চলে গেল। আরো জানিয়ে গেল যে কালো পোশাক পরা মহিলাদের সাথে কথা বলতে চাওয়া উচিত নয়। তারা বিবাহিত। রীতিনীতি মেনে চলা সবার দরকার।

হতাশ হয় ইংরেজ। হয়ত ভুল করছে। কিন্তু সান্তিয়াগোর মনে কোন হতাশা নেই। সে জানে, যখন কেউ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে তখন সারা জগৎ তাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করবে।

'আমি আগে কখনো এ্যালকেমিস্টের কথা শুনিনি। হয়ত এখানকার কেউ শোনেনি।'

জ্বলে উঠল ইংরেজ লোকটার চোখের তারা, 'তাইতো! হয়ত এখানকার কেউ জানেই না এ্যালকেমিস্ট আসলে কী! খুজে বের কর কে লোকের অসুখ বিসুখ সারায়।'

এখন শুধু কালো পোশাকে শরীর ঢাকা মহিলারা আসছে কুয়ার কাছে।

অবশেষে একজন পুরুষ এলে সান্তিয়াগো জিজ্ঞেস করল, 'লোকের রোগ হলে প্রতিকার করে এমন কাউকে চেনেন নাকি আপনি?'

'আমাদের অসুস্থতা সারান আল্লাহ।' দেখেই বোঝা যায়, নবাগতকে দেখে ভয় পেয়ে গেছে, 'কোন ডাক্তারকে খুজছেন?'

কোরান থেকে কয়েকটা আয়াত পড়েই চলে গেল সে।

আরো পরে আরেকজন আসে। বয়স একটু বেশি। কাধে বালতি। একই প্রশ্ন করে ছেলেটা।

'এমন লোক দিয়ে কী করবে তুমি?'

'কারণ এখানে আমার বন্ধু অনেক মাস ধরে কষ্ট করে এসেছে, তার সাথে দেখা করার জন্য।'

'যদি এমন কেউ এ মরুদ্যানে থেকে থাকে তো সে নিশ্চই খুব শক্তিমান,' ভাবে লোকটা একটু সময় ধরে, 'এমনকি গোত্রপতিরাও চাইলেই হুটহাট তার সাথে দেখা করতে পারে না। তিনি যদি চান তো দেখা হবে।

'যুদ্ধ শেষ হোক, তারপর ক্যারাভানের সাথে চলে যাবেন। মরুর জীবনে ঢোকার চেষ্টা করা ভাল নয়।' চলে গেল বয়স্ক লোকটাও।

এদিকে কিছুতেই হাল ছাড়বে না ইংরেজ। এখনো পথে আছে তারা।

অবশেষে কমবয়সি এক মেয়ে হাজির হল। কালো কাপড় নেই তার শরীরে। কাধে পাত্র ঝোলানো, মাথা কাপড়ে ঢাকা। মুখটা শুধু খোলা।

এগিয়ে যায় ছেলেটা। জিজ্ঞেস করে এ্যালকেমিস্টের কথা।

ঠিক তখনি কেমন যেন ধাক্কা লাগে তার বুকে। সারা দুনিয়ার আত্মারা যেন আঘাত করছে। মেয়েটার গহিন চোখ, হাসি আর নিরবতার মাঝামাঝি থাকা ঠোঁট তাকে সব ভাষার সেরা ভাষার কথা শিখিয়ে ছাড়ে। ভালবাসা। মানবজাতিরচেও পুরনো, মরুভূমিরচেও পুরনো। চোখে চোখে কী করে যেন সে ভাষার খানিকটা চলে যায়। তারপর হেসে ফেলে মেয়েটা।

লক্ষণ। হয়ত এ মেয়ে তার নিজের অজান্তেই সারা জীবন তার জন্য অপেক্ষা করেছে। এমন সব লক্ষণ ছড়িয়ে আছে আন্দালুসিয়ার পাহাড়ে পাহাড়ে, সাহারার মরুভূমিতে, সাগরের বুকে।

এ হল পৃথিবীর শুদ্ধতম ভাষা। হঠাৎ সান্তিয়াগোর মনে হয় সে পৃথিবীর একমাত্র নারীর সামনে দাড়িয়ে আছে আর মেয়েটাও টের পাচ্ছে একই অনুভূতি, কোন কথা নয়, শুধু অনুভূতি।

সে সব সময় বলে এসেছে যে অচেনা কাউকে হঠাৎ বিয়ে করে বসার আগে তাকে প্রেমে পড়তে হবে। কিন্তু অচেনা কাউকে এমন হঠাৎ করে ভাল লেগে যাবে তা ভাবাও কঠিন। আসলেই, পৃথিবীর সবকিছু এক হাতে লেখা। আর সব হৃদয়ে ভালবাসা দিয়ে পাঠান তিনি।

মাকতুব, ভাবে ছেলেটা।

ধরে একটু ঝাকায় ইংরেজ লোকটা, 'আরে! জিজ্ঞেস কর!'

সামনে এগিয়ে যায় সান্তিয়াগো, তারপর মেয়েটা যখন আবার হাসে, হেসে ওঠে সেও।

'নাম কী তোমার?'

'ফাতিমা।' চোখের পলক পড়ে মেয়েটার।

'আমাদের দেশে কোন কোন মেয়েকে লোকে এ নামেই ডাকে।'

'নবির মেয়ের নাম।' বলল ফাতিমা, 'দিগ্বিজয়ীরা সবখানে নামটাকে ছড়িয়ে দিয়েছিল।'

সুন্দর মেয়েটা যখন যোদ্ধাদের কথা বলে, তখন গর্ব ফুটে ওঠে তার চোখেমুখে। তাই আরো সুন্দর দেখায়।

ইংরেজ লোকটার তাড়া খেয়ে অবশেষে আসল প্রসঙ্গে আসে সান্তিয়াগো। লোকের অসুখ সারায় যে, সে কোথায়।

'এ লোকটা জীবনের সব রহস্যের কথা জানে।' বলল মেয়েটা, 'যোগাযোগ করতে পারে মরুভূমির জিনদের সাথেও।'

জিন হল ভাল আর মন্দে মিশানো এক ধরনের আত্মিক অবয়ব। দক্ষিণে দেখায় মেয়েটা। সেখানে আছে অদ্ভুত সেই লোক। তারপর পাত্র ভরে নিয়ে রওনা দেয়।

সাথে সাথে রওনা দেয় ইংরেজও। কোন একদিন, কুয়ার পাশে বসে বসে আপনমনে নিজেকে শোনায় সান্তিয়াগো, আমি তারিফায় বসে ছিলাম। আর বাতাস এসেছিল দূর আফ্রিকার বুক থেকে। সুন্দর মেয়ের সুঘ্রাণ নিয়ে এসেছিল।

বুঝতে পারে সে, দেখার আগে থেকেই ভালবাসে এ মেয়েকে। জানে, এ মেয়ের জন্য থাকা ভালবাসাই তাকে পৃথিবীর সব গুপ্তধন আবিষ্কারের পথে রাহা খরচ যোগাবে।

পরদিন সে আবার ফিরে যায় সেই কুয়ার কাছে। অবাক ব্যাপার, ইংরেজ লোকটা সেখানে দাড়িয়ে তাকিয়ে আছে মরুভুমির দিকে।

'আমি সারাটা বিকাল আর সন্ধ্যা অপেক্ষা করলাম। সে এল সন্ধ্যার প্রথম তারা উঠে আসার সাথে সাথে। জানালাম কী খোজ করছি সে কথা।

'প্রশ্ন করল কখনো অন্য কোন ধাতুকে সোনা বানিয়েছি কিনা।

'বললাম, এসব জানতেই এসেছি। আমাকে তখন বলল, আগে বানাতে জানতে হবে। এটুকুই সব, "যাও আর চেষ্টা কর।"

কোন জবাব নেই ছেলেটার মুখে। বেচারা ইংরেজ সারাটা পথ পেরিয়ে এসেছে এ কথা শোনার জন্য যে সে যে চেষ্টা করে আসছে অনেক আগে থেকে সেটাই করে যেতে হবে।

'তাহলে... চেষ্টা কর।'

'তাই করব। শুরু করব এখনি।'

ইংরেজ চলে যাবার পর এল ফাতিমা। ভরে নিল তার পানির পাত্র।

'একটা কথা বলার জন্য এসেছি এখানে, ফাতিমা। তোমাকে স্ত্রী করে পেতে চাই। ভালবাসি।'

মেয়েটা সাথে সাথে পাত্র ফেলে দেয় হাত থেকে। ছিটকে পড়ে পানি।

'প্রতিদিন এখানে অপেক্ষা করব তোমার জন্য। সাগর আর মরুভূমি পেরিয়ে এসেছি এখানে, পিরামিডের দেশে, একটা গুপ্তধনের সন্ধানে। আমার কাছে যুদ্ধটা রীতিমত অভিশাপ। কিন্তু এখন তাই আবার আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। কারণ দেখা পেয়েছি তোমার।'

'এক সময় থেমে যাবে যুদ্ধ।'

আশপাশে, খেজুর বনে তাকায় সান্তিয়াগো। নিজেকে শোনায়, সে একজন রাখাল ছেলে, আর চাইলেই আবারো রাখাল হয়ে যেতে পারবে। শুধু এসেছে গুপ্তধনের খোজে। আর তার কাছে গুপ্তধনেরচে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ফাতিমা।

'গোত্রের লোকেরা সব সময় গুপ্তধনের তালাশে থাকে,' যেন মেয়েটা ধরে ফেলেছে সান্তিয়াগোর চিন্তা, 'আর মরুর মেয়েরা তাদের গোত্রের ছেলেদের নিয়ে গর্ব করে।'

পাত্র ভরে নিয়ে ফিরে গেল সে।

প্রতিদিন সান্তিয়াগো যায় সেই কুয়ার কাছে। দাঁড়িয়ে থাকে। অপেক্ষায় থাকে। তারপর একটু একটু করে শোনায় নিজের জীবনের কাহিনী।

ফাতিমার সাথে কাটানো দিনের পনেরটা মিনিট ছাড়া বাকি সময় যেন কাটতেই চায় না।

মাস খানেক পেরিয়ে যাবার পর দলনেতা ক্যারাভানের সবাইকে ডাকল।

'কে জানে কখন থামবে যুদ্ধ, আর কে জানে কখন বেরিয়ে পড়ব আমরা! যুদ্ধ চলতে পারে অনেক সময় ধরে। হয়ত এক বছর। হয়ত আরো বেশি। দু পক্ষের শক্তি অনেক। তাদের কাছে যুদ্ধের গুরুত্বও অনেক। এটা কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের যুদ্ধ নয়। দু পক্ষই শক্তির ভারসাম্যের জন্য লড়ছে, আর যখন এমনধারা যুদ্ধ একবার শুরু হয়, তখন চলতেই থাকে। কারণ এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ দু পক্ষকেই মদদ দেন।'

সবাই চলে যায় যার যার থাকার জায়গায়। ছেলেটা যায় ফাতিমার জন্য। সেদিন বিকালে তার কথা হয় ক্যারাভানের ব্যাপারে।

'আমাদের দেখা হবার পরদিন বলেছিলে না, ভালবাস আমাকে? তারপর শিখিয়ে দিলে মহাজাগতিক ভাষার ব্যাপারে, শিখালে বিশ্বের আত্মার কথা। এসব মিলিয়ে আমি কেমন যেন তোমারি অংশ হয়ে গেছি।'

ফাতিমার রিনরিনে কণ্ঠ টের পায় সান্তিয়াগো। তার কাছে খেজুরগাছে বাতাসের হুটোপুটির শব্দ আর তেমন ভাল লাগে না।

'এ মরুদ্যানে তোমার জন্য অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করছি। ভুলে গেছি অতীতের কথা, আমার রীতিনীতির কথা, ভুলে গেছি মরুর বুকে পুরুষ নারীকে কীভাবে চায় সে কথাও। ছেলেবেলার পর থেকে মনে হত মরুভূমি আমাকে দারুণ কোন উপহার দিবে। পেয়ে গেছি সেটা।'

সান্তিয়াগো চায় একটা হাত তুলে নিতে। কিন্তু ফাতিমা আকড়ে আছে পানির পাত্র।

'তুমি স্বপ্নের কথা বলেছ, বলেছ বুড়ো রাজা আর নানা কথা। বলেছ লক্ষণের কথা। আমিতো ভয় পাই না। কারণ লক্ষণ টেনে এনেছে তোমাকে। আমার কাছে। এখন আমি তোমার স্বপ্নের অংশ, তোমার লক্ষ্যের অংশ।

'তাই আমার মনে হয়, তোমার উচিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া। যুদ্ধ থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাইলে কর। কিন্তু আগে যাবার কথা ভাবলে

এগিয়ে যাও। যাও লক্ষ্যের দিকে। মরুর বুকের ঢেউগুলো হররোজ বাতাসে বাতাসে বদলে যায়। বদলায় না শুধু মরুভূমি। এভাবেই বদলাবে না আমাদের ভালবাসা।

'মাকতুব,' বলে সে, 'আমি সত্যি তোমার স্বপ্নের অংশ হয়ে থাকলে একদিন ফিরে আসবে তুমি আমার কাছে।'

তার মন খারাপ হয়ে যায়। বিয়ে করা সব রাখালের কথা মনে পড়ে যায়। তাদের স্ত্রীদের বোঝাতে হয় কেন দূরের মাঠে যেতে হবে। ভালবাসা তাদের একত্রে রাখতে চায়।

পরের দেখায় সে কথা জানাল সান্তিয়াগো ফাতিমাকে।

'মরুভূমি আমাদের কাছ থেকে আপনজন কেড়ে নেয়, মাঝে মাঝে আর ফিরে আসে না তারা। আমরাও জানি। যারা আর ফেরে না, হয়ে যায় মেঘের অংশ। তারা আমাদের জীবগুলোর অংশ হয়ে যায়, হয়ে যায় পৃথিবীর আত্মা।

'কেউ কেউ সত্যি ফিরে আসে। তখন আশায় বুক বাধে অন্যেরা। আমি হিংসা করতাম সেসব মেয়েকে। এখন থেকে আমিও একজনের অপেক্ষায় থাকব।

'আমি মরুর মেয়ে, গর্ব করি ব্যাপারটা নিয়ে। চাই, আমার স্বামীও বাতাসের মত, মরুভূমির বালির ঢেউয়ের মত এগিয়ে যাক। আর যদি সে ফিরে না আসে, ধরে নিব, হয়ে গেছে মাটি পানি মেঘের অংশীদার।'

ফাতিমার ব্যাপারে বলার জন্য সান্তিয়াগো ইংরেজ লোকটার খোজ করে। অবাক হয়ে দেখে, তাবুর বাইরে একটা ফার্নেস বানিয়ে বসে আছে সে। নিচে কাঠখড়ের আগুন, উপরে স্বচ্ছ এক ফ্লাস্ক। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে মরুভূমির দিকে, মাঝে মাঝে বইয়ের দিকে।

'এ হল কাজের প্রথম ধাপ। প্রথমে সালফার সরিয়ে ফেলতে হবে। কঠিন কাজ। করতে হলে ব্যর্থতার ভয় আছে। তবু করব। দশ বছর আগে ভয় পেয়ে যে কাজ বন্ধ করেছিলাম, আবার শুরু করব সেটা। তবু, বিশ বছর যে অপেক্ষা করিনি তাতেই মহাখুশি।'

আস্তে আস্তে সূর্য নেমে যায়। সান্তিয়াগো ভাবে, নিজের প্রশ্নগুলোর কথা জিজ্ঞেস করতে হবে মরুভূমিকে।

ভাবতে ভাবতেই টের পায়, কিসের যেন ছায়া পড়েছে তার উপর। উপরে তাকিয়ে এক জোড়া শিকারি পাখি দেখে।

পাখিগুলো যুদ্ধ করছে। তাকিয়ে থাকে সে। কে জানে, তারা হয়ত বেদখল ভালবাসার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে পারবে।

কেমন যেন ঘুম ঘুম পাচ্ছে সান্তিয়াগোর। ইচ্ছা হয় জেগে থাকতে, আবার মনে হয় ঘুমিয়ে পড়ে এখনি।

'আমি বিশ্বের ভাষা শিখছি, আর তাই পৃথিবীর প্রতিটা বিষয় খোলাসা হয়ে যাচ্ছে আমার সামনে... এমনকি লড়তে থাকা শিকারী পাখিরাও।'

কেন যেন তার প্রেমে পড়াটা ভাল লাগতে শুরু করে। তুমি যখন কাউকে ভালবাসবে, অনেক ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে যাবে তোমার সামনে।

একটা পাখি আরেকটার উপর নেমে আসে এক পলকে। তীব্র বেগে। হঠাৎ মরুভূমির দিকে তাকিয়ে সে যেন দেখতে পায় একদল যোদ্ধাকে। দেখে তাদের তলোয়ারের ঝলকানি। মনে বিবশতা চলে আসে। এক মুহূর্তের জন্য। মরিচিকা হবে হয়ত। আগেও বেশ কয়েকবার দেখেছে সে। সেনাদল আসবে কোন দুঃখে!

সব সময় লক্ষণ অনুসরণ কর। বলেছিল বয়েসি রাজা। এবার বুঝতে পারে সে, কল্পনায় যে দৃশ্য দেখেছে বাস্তবে তাই হবে।

উঠে দাড়ায়। চলতে শুরু করে খেজুর বনের ভিতরে। এখন মরুভূমি নিরাপদ, আর বিপদ আছে মরুদ্যানেই।

এক গাছের নিচে বসে ছিল উটওয়ালা। সান্তিয়াগো তার দিকে এগিয়ে যায়।

'সেনাবাহিনী আসবে। জেনেছি। মানে দেখেছি মনের চোখে।'

'মরুভূমি এমনি এক জায়গা যেখানে মানুষ চোখে অনেক কিছু দেখে।'

তখন সান্তিয়াগো সবকিছু খুলে বলে।

মাঝে মাঝে মানুষের কাছে পুরো সময় হয়ে যায় একটা বই। দমকা হাওয়ায় সে বইয়ের কোন কোন পাতা খুলে যায়। পৃথিবীর সব বিষয় মাঝে মাঝে এভাবে খুলে যায়।

মরুভূমিতে এমন মানুষ আছে যারা বিশ্বের আত্মায় প্রবেশ করতে পারে। নাম তাদের সির। তাদেরকে সবাই ভয় পেয়ে চলে। তারা সাবধানে তাদের কথাও জেনে নেয়, কারণ যুদ্ধে কে মরবে আর কে বাচবে কেউ জানে না। গোত্রের মানুষ যুদ্ধ করতে চায়। চায় অনিশ্চয়তার স্বাদ পেতে। ভবিষ্যত তো আল্লাহই লিখে রেখেছেন। আর যা তিনি লিখে রেখেছেন তা মানুষের ভালর জন্য করা।

তাই গোত্রের লোকজন দল বেধে বাস করে। তারা চায় যুদ্ধ করতে। বর্তমান নিয়ে থাকতে। অনেক ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। জানতে চায় কোথায় শত্রুর তলোয়ার, কোথায় ঘোড়া। পরের বার কোন আঘাত করলে মারা যাবার সম্ভাবনা থাকবে না?

উটচালক যোদ্ধা না হলেও সিরদের সাথে উঠাবসা ছিল। অনেকের কথা সত্যি হয়, কারো কারো কথা হয় ভুল। সবচে বেশি বয়েসি এবং সবচে বেশি ভয় পাওয়া হয় যাকে, সেই বয়েসি সির তাকে অনেক কথা শোনায় একদিন। জানায় কেন উটচালক ভবিষ্যতের ব্যাপারে এত বেশি উৎসুক।

'কেন আবার, যেন কাজ করতে পারি,' জবাব দেয় উট চালক, 'যেন যেসব ব্যাপার চাই না সেগুলো এড়িয়ে যেতে পারি।'

'তখনি এড়িয়ে যেতে পারবে যখন সেগুলো তোমার ভবিষ্যতের অংশ হবে না।'

'হয়ত আমি ভবিষ্যত জানতে চাই এজন্য যে যাই আসুক না কেন সামনে, সেটার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।'

'ভাল ব্যাপার আসলে তা হবে দারুণ চমক। আর যদি খারাপ খবর আসে, তাহলে আসার আগেই তুমি মুষড়ে পড়বে। কারণ তুমি আগে থেকেই ভোগান্তির কথা জান।'

'ভবিষ্যত জানতে চাই কারণ আমি একজন মানুষ। আর মানুষ সব সময় ভবিষ্যতের উপর ভর করে জীবন চালায়।'

লোকটার বিশেষ গুণ হল, মাটিতে একতাল ছক্কা ফেলে সেগুলো দেখে মানুষের ভবিষ্যত বলা। এবার সে আর সে কাজটা করে না। ছক্কাগুলো হাতে নিয়ে পেচিয়ে ফেলে কাপড়ে।

'আমি লোকের জীবনের ভবিষ্যদ্বাণী করে বেড়াই, এভাবেই জীবন চালাই। জানি কী করে ছক্কাগুলোকে মারতে হয়। কী করে তাদের ঢোকাতে হয় মহাকালের বইয়ের ভিতরে যেখানে লেখা আছে সব কথা। এভাবে আমি ভবিষ্যত পড়ি, দেখতে পাই ভুলে যাওয়া অতীত আর চিনতে পারি সুলক্ষণ।

'লোকে আমার কাছে কাজের জন্য এলে আমি যে ভবিষ্যত দেখতে পাই একেবারে স্পষ্ট এমন নয়। অনুমান করি হিসাবের উপর নির্ভর করে। আর সবকিছুর মত ভবিষ্যতও ঈশ্বরের, তিনি বিচিত্র সব উপায়ে হাজির করেন আমাদের ভবিষ্যতের সামনে। কী করে ভবিষ্যত নিরুপণ করি? বর্তমানের লক্ষণ বিচার করে। বর্তমানে মনোযোগ দাও, ভবিষ্যত বদলে যাবে। সব ভুলে গিয়ে বরং প্রতিদিন সুন্দরভাবে কাটানোর চেষ্টা কর। ঈশ্বর তার সৃষ্টিকে অনেক ভালবাসেন। প্রতিদিন দিন শুরু হয় অসীম সম্ভাবনা নিয়ে।'

কোন পরিস্থিতিতে স্রষ্টা তাকে ভবিষ্যত জানার ব্যাপারে সহায়তা করতে পারেন?

'শুধু তখনি, যখন স্বয়ং তিনি সেটাকে তোমার সামনে হাজির করবেন। তিনি তা করেন শুধু এজন্য যে এ ভবিষ্যতটা সত্যি ভবিষ্যত, কিন্তু লেখা হয়েছে বদলে দেয়ার জন্য।'

ঈশ্বর ছেলেটাকে ভবিষ্যতের এক ঝলক দেখিয়েছেন, ভাবে উটচালক। যদি তিনি সত্যি সত্যি ছেলেটাকে তার পক্ষ হয়ে সেবা করতে পাঠিয়ে থাকেন?

'যাও, আর কথা বল গোত্রপতিদের সাথে। জানিয়ে দাও যে সেনাদল আসছে।'

'হাসবে তো!'

'তারা মরুর মানুষ। আর মরুর মানুষ লক্ষণ বিচার করে সব সময়।'

'তাহলে তারা এর মধ্যেই হয়ত জেনে গেছে।'

'কিন্তু এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। তারা বিশ্বাস করে যদি সত্যি আল্লাহ চান তারা ভবিষ্যত সম্পর্কে জানুক, তাহলে অন্য কেউ তাদের জানাবে। আগেও অনেকবার এমন হয়েছে। এবার যে জানে সে হলে তুমি।'

ফাতিমার কথা মনে পড়ে যায় ছেলেটার। সিদ্ধান্ত নেয়, দেখা করবে গোত্রপতিদের সাথে।

মরুদ্যানের কেন্দ্রে থাকা বিশাল সাদা তাবুর দিকে এগিয়ে গেল সান্তিয়াগো প্রহরীকে পাশ কাটিয়ে।

'আমি গোত্রপতিদের সাথে দেখা করতে চাই। মরুভূমি থেকে লক্ষণ পেয়েছি।'

কোন সাড়া না দিয়ে প্রহরী ঢুকে যায় তাবুর ভিতরে। বেরিয়ে আসে সাদা আর সোনালি পোশাক পরা এক তরুণ আরবকে নিয়ে।

সব খুলে বলল ছেলেটা। লোকটা অপেক্ষা করতে বলে আবার চলে যায় ভিতরে।

নেমে আসে রাত। একে একে উত্তেজিত সেনারা আসা যাওয়া করতে থাকে তাবুতে। তারপর নিভিয়ে দেয়া হয় মরুদ্যানের সব আলো। আলো জ্বলছে শুধু বড় তাবুতে।

এই পুরো সময় জুড়ে সান্তিয়াগো শুধু ফাতিমার কথা ভেবেছে। শেষ কথাগুলোর অর্থ বের করার চেষ্টা করেছে।

অবশেষে প্রহরীরা তাকে ভিতরে যেতে বলে। ভিতরে ঢুকে অবাক হয়ে যায় সান্তিয়াগো। মরুভূমির মাঝখানে এত সুন্দর তাবু থাকতে পারে তা তার কল্পনাতেও ছিল না। জীবনে দেখেনি, এত সুন্দর গালিচায় পা রেখে এগিয়ে যায় সে। খাটি সোনার তৈরি বাতিদান ঝুলছে উপর থেকে। প্রত্যেকটায় একটা করে মোমবাতি। গোত্রপতিরা বসে আছে অর্ধবৃত্ত তৈরি করে। দামি বিছানা আর কাজ করা লম্বা বালিশে ঠেস দিয়ে। মসলা আর চা নিয়ে যাতায়ত করছে চাকর বাকরের দল। বাকিরা ঠিক করছে হুকার আগুন। বাতাসে ধোয়ার মৃদু সুগন্ধ।

সব মিলিয়ে আটজন গোত্রপতি। এক মুহূর্তেই সবচে গুরুত্বপূর্ণ কে তা বোঝা যায়। সাদা আর সোনায় মোড়ানো এক আরব। অর্ধবৃত্তের একেবারে মাঝখানে বসে আছে। একটু আগে কথা বলেছে যে তরুণ আরবের সাথে সেও আছে সেখানে।

'লক্ষণ নিয়ে কথা বলে, কে এ নবাগত?' এক গোত্রপতি বলে সান্তিয়াগোকে দেখতে দেখতে।

'আমি।' বলে সে। তারপর জানায় সে সময়ের ঘটনাটুকু।

'মরুভূমি সবাইকে বাদ দিয়ে এক নবাগতকে এসব কথা কেন জানাবে? আমরা তো এখানে বাস করি অনেক পুরুষ ধরে।' বলে ওঠে আরেক গোত্রপতি।

'কারণ আমার চোখ এখনো মরুর সাথে মানিয়ে নিতে পারেনি। আমি এমন সব ব্যাপার দেখতে পাব যা মরুভূমিতে থাকা অভ্যস্ত চোখ দেখবে না।'

আর এজন্যও যে, আমি বিশ্বের আত্মার কথা জানি। নিজেকে বলে সান্তিয়াগো।

'মরুদ্যান হল নিরপেক্ষ এলাকা। কেউ এখানে আক্রমণ করে না।' বলল তৃতীয় গোত্রপতি।

'আমি যা দেখেছি শুধু তাই বলেছি। বিশ্বাস না করলে এসব নিয়ে কোন কিছু করবেন না।'

তারপর আলোচনা শুরু হয়ে যায়। আরবির এমন এক উচ্চারণে কথা বলে তারা যে ছেলেটা বুঝতে পারে না একটুও।

সবাই চলে যেতে ধরলেও প্রহরী তাকে থাকতে বলে। লক্ষণ ভাল নয়। এসব কথা উটওয়লাকে না বললেই হত। ভয় করছে।

তারপর হঠাৎ করে একটু আশ্বাসের হাসি দেয় মাঝের গোত্রপতি। ভাল লাগে সান্তিয়াগোর। এতক্ষণ সে কথায় যোগ দেয়নি। না দিক, বিশ্বের ভাষা সম্পর্কে তার একটা ধারণা তৈরি হয়ে গেছে। টের পায় তাবুর বাইরে ছোটাছুটির কম্পন। বুঝতে পারে, এসে ভালই করেছে।

শেষ হল আলোচনা। বুড়ো লোকটার কথা শুনে সেই লোক তাকায় সান্তিয়াগোর দিকে। এবার তার দৃষ্টি শিতল।

'দু হাজার বছর আগে, অনেক দূরের এক দেশে, স্বপ্নে বিশ্বাস করা এক ছেলেকে নিক্ষেপ করা হয় কারাগারে। সেখান থেকে বিক্রি করে দেয়া হয় দাস হিসাবে।' বলছে বুড়ো লোকটা, এখন এমন এক উচ্চারণে যা বোঝা সম্ভব, 'আমাদের ব্যবসায়িরা সেই লোককে কিনে আনে। নিয়ে আসে মিশরে। আমাদের সবাই জানে যে যে লোক স্বপ্ন চেনে সে স্বপ্ন ব্যাখ্যাও করতে পারে।'

বলে যাচ্ছে বয়েসি লোকটা এখনো, 'যখন ফারাও মোটা গরুর স্বপ্ন দেখল, এ লোকটা তাদের দেশকে, মিশরকে বাচিয়েছিল। নাম তার ইউসুফ।

সে নিজেও ছিল নতুন দেশে নতুন মানুষ। এবং সম্ভবত তার বয়সও ছিল তোমার মতই।'

থামল সে। এখনো চোখের দৃষ্টি ঠিক বন্ধুসুলভ নয়।

'আমরা সব সময় ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টি রাখি। মিশরকে বাচানোর সেই ইতিহাসের কথা মনে রাখি। এ ঐতিহ্যেই লেখা আছে কী করে মরুভূমি পার হতে হয়, কার সাথে বিয়ে দিতে হয় সন্তানকে। ঐতিহ্য বলে, একটা মরুদ্যান আসলে নিরপেক্ষ এলাকা। দু পক্ষেরই মরুদ্যান আছে আর দু পক্ষই সাঙ্ঘাতিক ক্ষতিগ্রস্থ হবে।'

বয়োবৃদ্ধের কথায় কেউ বাধা দিচ্ছে না।

'আবার ঐতিহ্য আমাদের শিখায় যে মরুভূমির কথা বিশ্বাস করতে হয়। যা জানি, সব শিখিয়েছে মরুভূমিগুলো।'

বয়েসি লোকটার এক ইশারায় দাড়িয়ে গেল সবাই। সমাবেশ শেষ। নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হুকাগুলো। সার বেধে দাড়িয়ে আছে সৈন্যরা। যাবার জন্য প্রস্তুত হল সান্তিয়াগো। কথা বলে উঠল লোকটা আবার:

'কাল আমরা সে নিয়ম ভাঙব যেটায় বলা আছে যে মরুদ্যানে কেউ অস্ত্রপাতি বহন করতে পারবে না। সারাদিন তন্ন তন্ন করে খুজব শত্রুদের। সূর্যাস্তের পর আবার সবাই যার যার অস্ত্র জমা দিবে। প্রতি দশজন খতম হওয়া শত্রুর জন্য তুমি পাবে একটা করে সোনার মোহর।

'কিন্তু তারাও যুদ্ধে যাবার আগ পর্যন্ত অস্ত্র সংবরণ করা যাবে না। অস্ত্র মরুর মতই। ব্যবহার না করলে পরে আর কাজে লাগানো যায় না। কাল সন্ধ্যার মধ্যে কোনটাই যদি ব্যবহার না করা যায়, অন্তত একটা ব্যবহার করা হবে তোমার উপর।'

তাবু ছেড়ে সান্তিয়াগো বাইরে এসে দেখে মরুদ্যানে শুধু চাঁদের আলো। নিজের তাবুতে যেতে মিনিট বিশেক সময় লাগবে। রওনা হয়ে গেল সে।

যা করার করতে পেরেছে সে। পেরেছে বিশ্বের আত্মায় ঢুকতে। আর এর বিনিময়ে তাকে এখন জীবনের মূল্য দিতে হবে। ভয়ানক বাজি। কিন্তু সেই ভেড়াগুলো বিকিয়ে দেয়ার পর থেকে তার ভয়ানক বাজির শুরু।

উটওয়ালা বলেছিল সেদিন, কাল মারা যাওয়া আর যে কোন একদিন মারা যাওয়া একই কথা। সব নির্ভর করছে একটা শব্দের উপর: মাকতুব।

একা পথ চলতে চলতে তার মোটেও খারাপ লাগে না। কাল যদি মারা যায় তো যাবে ঈশ্বর ভবিষ্যত বদলাতে চাননি বলে। মারা যাবার আগে তার অনেক অর্জন হয়েছে। দেখেছে আন্দালুসিয়ার দিগন্ত, সাগর, পাহাড়, মরুভূমি, দুটা মহাদেশ, করেছে নানা কাজ, দেখেছে ফাতিমার রহস্যময় চোখ। বহুদিন

আগে বাসা ছেড়ে আসার পর থেকে বেচে নিয়েছে ইচ্ছামত। আনন্দে। কাল মারা গেলেই কী, আর সব রাখালেরচে অনেক বেশি দেখা হয়েছে এ ছোট জীবনে।

হঠাৎ তীব্র একটা শব্দ। তারপর পড়ে যায় সে কীসের যেন ধাক্কায়। ধুলি উড়ে অন্ধকার হয়ে যায় আশপাশ।

এরপর দেখতে পায় অতিকায় এক আরবি ঘোড়া টগবগিয়ে ছুটে যাচ্ছে। ঘোড়ার সওয়ারির সারা মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা।

সম্ভবত মরুভূমি থেকে এসেছে গুপ্তচর। সংবাদবাহক। কিন্তু তার উপস্থিতি সংবাদ বাহকেরচেও শক্তিময়।

কোমর থেকে বের করে ঝকঝকে বাকানো আরবি তলোয়ার।

'কে উড়ন্ত শিকারি পাখির অর্থ বলার স্পর্ধা দেখায়!' চিৎকার করে ওঠে সর্বশক্তিতে। তার সেই আওয়াজ যেন আল ফাইউমের পঞ্চাশ হাজার খেজুরগাছে তোলে আলোড়ন।

সান্তিয়াগো মাতামারোসের কথা মনে পড়ে যায় সান্তিয়াগোর। একই রকম বিশাল ঘোড়ায় চড়ে ছিলেন তিনি। শুধু পরিস্থিতি এখন বিপরীত।

'সে স্পর্ধা আমি দেখিয়েছি!'

আবার মনের পর্দায় ভেসে ওঠেন সান্তিয়াগো মাতামারোস।

'সে স্পর্ধা আমি দেখিয়েছি!' বলে আবার। নুইয়ে দেয় মাথাটা, যেন তলোয়ারের আঘাত পড়তে পারে, 'বেচে যাবে অনেক প্রাণ, কারণ আমি সৃষ্টিজগতের প্রাণের ভিতর দিয়ে দেখতে পেরেছিলাম।'

তীব্র বেগে নেমে আসেনি তলোয়ারটা। বরং নেমে আসে ধীরে। অনেক ধীরে। আস্তে করে স্পর্শ করে সান্তিয়াগোর কপাল। এক ফোটা রক্ত ঝরে পড়ে সেখান থেকে।

একটুও নড়ছে না ঘোরসওয়ার। নড়ছে না ছেলেটাও। মনে কেন যেন এক বিন্দু ভয় নেই। সে স্বপ্নের পথ চলতে চলতে মারা যাবে আজ। কী আনন্দ মনের গভীরে! আনন্দ ফাতিমার জন্য। অবশেষে লক্ষণগুলো সত্যি বলে প্রমাণিত হল।

ভয়ের কিছু নেই। আর একটু পরই সে বিশ্ব-আত্মার অংশ হয়ে যাবে। হবে তার শত্রুরাও। আগামিকাল।

এখনো তলোয়ার ধরে রেখেছে আগন্তুক, 'কেন উড়ন্ত শিকারি পাখির লক্ষণ পড়লে?'

'আমি পড়েছি শুধু তাই যা পাখিরা বলতে চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল মরুদ্যানকে বাচাতে। কাল মারা যাবে তোমরা সবাই, কারণ এ মরুদ্যানে তোমাদেরচে বেশি লোক আছে।'

'আল্লাহ যা চেয়েছেন তা বদলানোর কে তুমি?'

তলোয়ার এখনো আগের জায়গায় ঠেকানো।

'আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন বাহিনীকে, যেমন সৃষ্টি করেছেন ঐ পাখির জোড়া। তিনি আল্লাহ, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন পাখির ভাষা। সবকিছু এক হাতে লেখা,' মনে পড়ে যায় আবার সেই উটচারীর কথা।

সরে গেল তরবারি। কেমন এক মুক্তির স্বাদ ছড়িয়ে যায় সান্তিয়াগোর প্রাণে। এখনো নড়তে পারছে না।

'তোমার ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে সাবধান থেক। লেখা হয়ে গেলে তা আর বদলানো যায় না।'

'আমি শুধু একটা বাহিনী দেখেছি। যুদ্ধের ফল দেখিনি।'

উত্তর শুনে যেন তুষ্ট হল ঘোরসওয়ারি। এখনো হাতে অস্ত্র।

'আজব দেশে আজব ছেলের কী দরকার?'

'আমি লক্ষ্য লক্ষ্য করে এগুচ্ছি। আমাকে তুমি বুঝে উঠতে পারবে না এক পলকে।'

তলোয়ার সরিয়ে নিল মুখঢাকা লোকটা। ভরে ফেলল খাপে।

আরো একটু স্বস্তি হয় সান্তিয়াগোর।

'তোমার সাহস পরখ করতে হত আমাকে,' বলে আগন্তুক, 'উৎসাহ আর সাহস হল পৃথিবীর ভাষা বোঝার সবচে কার্যকর উপায়।'

অবাক হয় ছেলেটা। সে এমন কোন ব্যাপারে কথা বলছে যা খুব কম মানুষই বোঝে।

'এত দূরে আসার পর তোমার হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। কিন্তু মনে রেখ, মরুভূমিকে ভালবাসতে পার, বিশ্বাস করতে পার না। কারণ মরুভূমি সবার সাহস খতিয়ে দেখে। প্রতি পদে পদে চ্যালেঞ্জ করে, যারা সাহস হারায় হারিয়ে দেয় তাদের চিরতরে।'

কথাটুকু শুনে আবার মনের ভিতরে চলে আসে বয়েসি রাজার কথা।

'যদি যোদ্ধারা এখানে আসার পরও তোমার মাথা ধড়ে থাকে, কাল সন্ধ্যার পর আমাকে খুজে বের করো।' বলে সওয়ারি।

তলোয়ার খাপ থেকে খুলে নিয়ে সে পা দিয়ে আঘাত করে ঘোড়ার পেটে। টগবগিয়ে ছুটতে থাকে শ্বেতঅশ্ব অন্ধকারের দিকে।

'কোথায় থাক তুমি?' চিৎকার করে প্রশ্ন তোলে ছেলেটা যেতে থাকা আরোহীর উদ্দেশে।

দক্ষিণে আঙুল তোলে লোকটা।

দেখা পেয়েছে সে।

সান্তিয়াগো দ্য এ্যালকেমিস্টের দেখা পেয়েছে।

পরদিন সকাল। আল ফাইউমের খেজুর গাছগুলোর এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে দু হাজার সশস্ত্র মানুষ।

মাথার উপর সূর্য উঠে আসার আগেই পাঁচশ গোত্রিয় মানুষ হাজির দেখা দেয় দিগন্তরেখায়। উত্তর থেকে এগিয়ে আসে দলটা। দেখে মনে হয় তারা যুদ্ধের জন্য আসেনি। কিন্তু আলখেল্লার নিচে লুকানো আছে অস্ত্র। ধারালো অস্ত্র।

আল ফাইউমের কেন্দ্রে পৌছে সাদা তাবুটার কাছে যায় তারা। তারপর বের করে রাইফেলগুলো। তলোয়ারগুলো। আক্রমণ করে একইসাথে।

তাবুতে কেউ ছিল না।

বাচ্চাদের আগেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে মরুদ্যান থেকে দূরে এক ঝোপঝাড়ওয়ালা এলাকায়। কিছু দেখেনি তারা। নারীরা বসে ছিল তাবুগুলোয়। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছিল স্বামীর জন্য। তারাও যুদ্ধের কোন নিশানা দেখতে পায়নি।

এদিকে চারপাশ থেকে, সেই মরুভূমি থেকেই আক্রমণকারীদের ঘিরে ছিল অন্য এক দল। আধঘন্টা পেরিয়ে যেতে না যেতেই মারা পড়ে আক্রমণকারীদের একজন ছাড়া সবাই।

সব মিলিয়ে, এখানে সেখানে লাশ পড়ে না থাকলে আর সব দিন থেকে আল ফাইউমের আজকের দিনটাকে আলাদা করা যেত না।

মারা হয়নি শুধু ব্যাটেলিয়নের কমান্ডারকে। সেদিন বিকালে তাকে হাজির করা হয় গোত্রপতিদের সামনে। প্রশ্ন ওঠে ঐতিহ্য ভঙ্গের ব্যাপারে। চিরাচরিত রীতি ভঙ্গের ব্যাপারে।

সেনাপতি জানায়, তার লোকজন ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর ছিল। যুদ্ধের জন্য দিনের পর দিন মরুভূমিতে থেকে থেকে একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে। ফলে মরুদ্যানটা দখল করে আবার যুদ্ধে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেয় তারা।

গোত্রপতিরা বলে যে তারা এ কথা শুনে দুঃখ পাচ্ছে, কিন্তু পবিত্র রীতি ভাঙা উচিত হয়নি। সব ধরনের সম্মান তুলে নিয়ে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। তলোয়ার বা গুলির বদলে তাকে মারা হয় মৃত খেজুরগাছ থেকে ফাসিতে ঝুলিয়ে। সেখানেই, মরুভূমির বাতাসে তার দেহ বারবার নড়েচড়ে উঠছিল।

গোত্রপ্রধান ডেকে পাঠায় সান্তিয়াগোকে। তুলে দেয় পঞ্চাশ টুকরা স্বর্ণ। আবার শোনায় মিশরে আসা ইউসুফের গল্প। ছেলেটাকে মরুদ্যানের প্রধান হতে বলে।

সূর্য ডুবে গেছে। প্রথম তারা উঠতে না উঠতে দক্ষিণে যাত্রা করে ছেলেটা। একটা মাত্র তাবু আছে সেখানে। পাশ দিয়ে যেতে থাকা লোকজন সাবধান করে দেয়, জিনের বাস এখানে।

তবু যাবে না সান্তিয়াগো। বসে পড়ে।

চাঁদ বেশি উপরে উঠে আসার আগেই আসতে থাকে ঘোরসওয়ার। কাধে দুটা মৃত শিকারি পাখি ঝোলানো।

'এসেছি।' বলে ছেলেটা।

'তোমার এখানে থাকা উচিত নয়,' বলে ওঠে এ্যালকেমিস্ট, 'নাকি লক্ষ্যই তোমাকে এখানে টেনে এনেছে?'

'গোত্রে গোত্রে যুদ্ধের সময় মরুভূমি পার হওয়া অসম্ভব। তাই এসেছি।'

ঘোড়া থেকে নামে এ্যালকেমিস্ট। ইশারায় তার সাথে তাবুর ভিতরে যেতে বলে। মরুভূমির আর দশটা তাবুর মত দেখতে জায়গাটা। এ্যালকেমিতে ব্যবহৃত আর সব জিনিসের জন্য তাকায় সে এদিক সেদিক। কিছু নেই। শুধু একতাল বই, কয়েকটা রান্নার সরঞ্জাম, আর রহস্যময় ডিজাইনে ভরা গালিচা।

'বসে পড়। পান করতে হবে কিছু। খেতে হবে পাখিগুলোকে।' এ্যালকেমিস্ট বলল।

মনে ক্ষীণ সন্দেহ হয়, কালকে দেখা সেই পাখি এগুলো। কিছু বলে না সান্তিয়াগো। বরং চুপচাপ দেখে যায়। রান্না শুরু হলে আস্তে আস্তে তাবু ভরে ওঠে সুগন্ধে। অন্তত হুকারচে ভাল ঘ্রাণ আছে।

'আমাকে দেখতে চেয়েছিলে কেন?' প্রশ্ন করে ছেলেটা অবশেষে।

'লক্ষণের জন্য।' কাটা কাটা জবাব দেয় এ্যালকেমিস্ট, 'বাতাস বলেছিল আসবে তুমি। বলেছিল, তোমার প্রয়োজন পড়বে সাহায্যের।'

'বাতাস আমার ব্যাপারে বলেনি। যার কথা বলেছে সেও চলছে সঠিক পথে। আরেক ভিনদেশি। জাতে ইংরেজ। সেই তোমার খোজে বের হয়েছে।'

'তাকে আগে বেশ কিছু কাজ শেষ করতে হবে। কথা সত্যি, সেও চলছে সঠিক পথে। বুঝতে শিখছে মরুভূমিকে।'

'আর আমি?'

'যখন কেউ সত্যি সত্যি কিছু চায়, পুরো বিশ্বব্রহ্মান্ড তাকে সেটা পাইয়ে দেয়ার জন্য ফিসফাস শুরু করে দেয়,' এ্যালকেমিস্টের কন্ঠ চিরে বেরুল কথাগুলো, সেই বয়েসি রাজার মত করে। বুঝতে পারে ছেলেটা। এখানে আরো একজন তার পথ চলতে সহায়তা করবে।

'তাহলে তুমি আমাকে শিক্ষা দিবে?'

'না। যা জানার সবটুকুই জেনে বসে আছ। তোমাকে শুধু তোমার গুপ্তধনের দিকে চোখ ফিরিয়ে দিব, ব্যস।'

'কিন্তু যুদ্ধের ঘনঘটা লেগে গেছে যে!'

'মরুভূমির কাহিনী আমি ভালভাবেই জানি।'

'আর আমি এর মধ্যেই পেয়ে গেছি সেই গুপ্তধন। উট আছে একটা, আছে স্ফটিকের দোকান দেয়ার টাকা, আছে অর্ধশত সোনার টুকরা। আমার দেশে প্রায় রাজার হালে থাকতে পারব।'

'কিন্তু এসবের কিছুই তুমি পিরামিড থেকে পাওনি।' ভুল ধরিয়ে দেয় এ্যালকেমিস্ট।

'আর আছে ফাতিমা। সে আর যে কোন সম্পদেরচে আমার কাছে বেশি মূল্যবান। পিরামিডের দেশের মেয়ে।'

'কিন্তু তাকে পিরামিডে পাওনি।'

এরপর তারা নিরবে খেয়ে চলে। বোতল খুলে লালচে একটা তরল ঢেলে দেয় এ্যালকেমিস্ট সান্তিয়াগোর কাপে। এত স্বাদের মদ এর আগে কখনো খায়নি সে।

'এখানে না মদ নিষিদ্ধ?'

'মানুষের মুখে যা ঢোকে তা খারাপ নয়,' বলে এ্যালকেমিস্ট, 'মুখ থেকে যা বেরোয় তা খারাপ।'

খাবার শেষ হলে তারা বেরিয়ে আসে বাইরে। বসে পড়ে খোলা আকাশের নিচে। এমন এক চাঁদের নিচে যা তারাগুলোকে একেবারে ম্লান করে দিয়েছে।

'পান কর, আর উপভোগ কর।' এ্যালকেমিস্ট বলে, ছেলেকে খুশি দেখে, 'আজ রাতে ভালভাবে বিশ্রাম করে নাও, যেন তুমি কোন যোদ্ধা, যেন প্রস্তুত হচ্ছ যুদ্ধের জন্য। মনে রেখ, যেখানেই তোমার গুপ্তধন থাক না কেন, তোমার হৃদয় ঠিক ঠিক তা খুজে বের করবে। তোমাকে সেই লুকানো সম্পদ উদ্ধার করতে হবে কারণ তোমার চলার পথে সবকিছু হতে হবে অর্থবহ।

'কাল, উট বেচে দিয়ে কিনে নিও একটা ঘোড়া। উটগুলো খানিকটা বিশ্বাসঘাতক। হাজার কদম চলার পরও যেন শ্রান্ত হয় না। তারপর, হঠাৎ করে হাটু ভেঙে বসে পড়ে। মুখ থুবড়ে নেতিয়ে পড়ে মারা যায়। এদিকে

ঘোড়ারা ক্লান্ত হয় আস্তে আস্তে। সব সময় বুঝতে পারবে তাদের কাছে কতটুকু চাওয়া যাবে। জানতে পারবে কখন তাদের মারা যাবার কথা।'

পরদিন রাতে একটা ঘোড়া নিয়ে এ্যালকেমিস্টের তাবুতে হাজির হয় ছেলেটা। এ্যালকেমিস্ট প্রস্তুত হয়ে রওনা দেয় তার সাথে। তারপর বলে, 'মরুর বুকে কোথায় কোথায় প্রাণ আছে একবার দেখিয়ে দাও। যারা এসব চিনতে পারে তারাই শুধু গুপ্তধন পেতে পারে।'

আকাশের চাঁদ আলো দিচ্ছে। এগিয়ে যাচ্ছে তারা মরুভূমির বুকে।

ভাবে সান্তিয়াগো, আলো না থাকলে এখানে প্রাণের অস্তিত্ব পাওয়া দুষ্কর। আমি এখনো মরুভূমিকে ঠিকমত চিনে উঠতে পারিনি।

কথাটা এ্যালকেমিস্টকে বলতে গিয়েও থেমে যায় সে। এখনো ভয় পায় তাকে। আকাশের পাখিগুলো যেখানে দেখেছিল, সেই পাথুরে জায়গায় হাজির হয় তারা। এখন এখানে শুধুই বাতাসের হাহাকার।

'মরুতে প্রাণ চিনতে শিখিনি এখনো। জানি, আছে কোথাও না কোথাও। কোথায়, তা জানি না।'

'জীবন আকর্ষণ করে জীবনকে।'

বুঝতে পারে সান্তিয়াগো। আলগা করে দেয় ঘোড়ার লাগাম। টগবগিয়ে ঘোড়াটা থামে পাথরের উপর। প্রায় আধঘন্টার জন্য ছুটে চলে ঘোড়া। সেইসাথে পাশে পাশে ছুটে চলে এ্যালকেমিস্ট। দূরের মরুদ্যান এখন আর দেখা যায় না। দেখা যায় শুধু বিচিত্র রঙের মলিন মরুভূমি আর আকাশের চাঁদ।

তারপর, একেবারে কারণ ছাড়াই ধীর হতে শুরু করে ঘোড়ার গতি।

'জীবন আছে এখানে,' এ্যালকেমিস্টকে বলে ছেলেটা, 'মরুর ভাষা এখনো আয়ত্ত করতে পারিনি, কিন্তু আমার ঘোড়া তা জানে।'

নেমে পড়ে তারা। কোন কথা নেই এ্যালকেমিস্টের মুখে। ধীরে এগুতে এগুতে তারা পাথরের দিকে তাকায়। হঠাৎ থেমে পড়ে এ্যালকেমিস্ট। নিচু হয়। পাথরের খাজে ছোটখাট এক গর্ত আছে। হাত পুরে দেয় এ্যালকেমিস্ট, পুরোটা, কাধ পর্যন্ত। কিছু নড়ছে সেখানে। দেখা যাচ্ছে এ্যালকেমিস্টের চোখ। শুধু চোখ। গর্তে যাই থাক না কেন, সেটা দখলের জন্য চেষ্টা করছে সে।

তারপর, ঝড়ের গতিতে বের করে আনে হাত। লাফিয়ে উপরে উঠে যায়। হাতে লেজের দিকে ধরা একটা গ্রাসপেড সাপ।

একই সাথে লাফিয়ে ওঠে সান্তিয়াগো। সরে যায় এ্যালকেমিস্টের কাছ থেকে দূরে। সাপটা জাতে গোক্ষুর। আর গোখরার মুখ থেকে যে বিষ বের হচ্ছে তা এক মিনিটের মধ্যে তরতাজা মানুষকে মেরে ফেলতে পারবে।

'বিষের দিকে নজর রাখ,' বলে ওঠে সান্তিয়াগো, কিন্তু এ্যালকেমিস্টের চোখেমুখে কোন ভাবান্তর নেই। গর্তে হাত ঢুকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করেছে এটাকে বের করার। এমন জাতসাপ যে কাটেনি তা বলা যায় না। আর কামড় খেয়ে থাকলে... 'দুশ বছর বয়স হয়েছে এ্যালকেমিস্টের,' বলেছিল ইংরেজ লোকটা। সে নিশ্চই মরুর সাপ নিয়ে কাজ করতে জানে।

ঝোলার ভিতর থেকে একটা জিনিস বের করে আনে এ্যালকেমিস্ট। তারপর বালিতে বৃত্ত একে ছেড়ে দেয় সাপটাকে। একেবারে শান্ত হয়ে আসে সেটা।

'ভয়ের কিছু নেই। সে আর বৃত্ত ছেড়ে বের হবে না। তুমি মরুর বুকে জীবন খুজে পেয়েছ। ভাল নিদর্শন। ভাল লক্ষণ।'

'এত গুরুত্বপূর্ণ কেন ব্যাপারটা?'

'কারণ পিরামিডের চারপাশে মরুভূমি।' বলে এ্যালকেমিস্ট।

কাল রাত থেকে সান্তিয়াগোর মন ভাল নেই। পিরামিড নিয়ে আর কোন কথা তুলতে চায় না সে নতুন করে। এখন গুপ্তধনের সন্ধানে বের হওয়া আর ফাতিমাকে ছেড়ে যাওয়া একই কথা।

'মরুভূমি পেরুনোর পথে আমি তোমাকে পথ দেখাব।' বলল এ্যালকেমিস্ট।

'আমিতো মরুদ্যানে থেকে যেতে চাই। ফাতিমাকে পেয়ে গেছি। আর যতদূর মনে হয়, সে গুপ্তধনেরচেও বেশি মূল্যবান।'

'ফাতিমা মরুর দেশের মেয়ে,' পাল্টা জবাব দেয় এ্যালকেমিস্ট, 'সে জানে, পুরুষদের যেতে হয় ফিরে আসার জন্য। আর সে তার গুপ্তধন এর মধ্যেই পেয়ে গেছে। তোমাকে। এখন তার কামনা যেন তুমি তোমার চাওয়াটা পাও।'

'কিন্তু, আমি যদি থেকে যেতে চাই?'

'তাহলে বলি কী হবে? তুমি হবে মরুদ্যানের উপদেষ্টা। স্বর্ণ দিয়ে কিনে ফেলবে অনেক ভেড়া আর উট। বিয়ে করে ফেলবে ফাতিমাকে। সুখে থাকবে বছরখানে। তুমি ভালবাসবে মরুভূমিকে, চিনতে শিখবে অর্ধলক্ষ খেজুরগাছের প্রতিটাকে। দেখবে, কী করে মরুভূমির বুকে বেড়ে ওঠে গাছগুলো। কী করে

ক্ষয়ে যায়। আর শিখবে অনেক কিছু, কারণ এখানে সবচে বড় শিক্ষক হল স্বয়ং সাহারা।

'তারপর, দ্বিতীয় বছরের কোন এক সময় মনে পড়ে যাবে গুপ্তধনের কথা। এতদিনে তোমার লক্ষণ বিচারের ব্যাপারগুলো আরো ধারালো হবে। সেগুলো অষ্টপ্রহর বলে যাবে গোপন সম্পদের ব্যাপারে। এদিকে চোখ পড়বে না। কল্যান করতে থাকবে পুরো মরুদ্যানের। গোত্রপতিরা সমস্বরে তোমার জ্ঞানে পঞ্চমুখ হয়ে পড়বে। উটের সাথে আসবে সম্পদ, সম্পদের সাথে ক্ষমতা।

'এবার তৃতীয় বছরের কথা বলি। তখন তুমি শুরু করে দিয়েছ গুপ্তধন আর স্বপ্নের কথা। জীবনের লক্ষ্যের কথা। ঘুরে বেড়াবে, রাতের পর রাত, মরুর বুকে, মরুদ্যানের বুকে, একা একা। ফাতিমা ভাববে তার জন্য আজ এ অবস্থা। কিন্তু তোমার ভালবাসা তার কাছ থেকে ভালবাসা আদায় করে নিচ্ছে কড়ায় গন্ডায়। খেয়াল করো, কখনো সে থাকতে বলছে না তোমাকে, কারণ বালির দেশের মেয়েরা সব সময় স্বামীর অপেক্ষায় থাকতে পছন্দ করে।

'রাতের পর রাত ঘুরে বেড়াচ্ছ তুমি মনের অস্থিরতা নিয়ে। এদিকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাচ্ছে গুপ্তধন।

'তারপর, চতুর্থ বছরের কোন এক সময় হারিয়ে যাবে লক্ষণগুলোও। কারণ তুমি তাদের কথায় কান দাও না। গোত্রপতিরা ঠিক ঠিক বুঝতে পারছে সব ব্যাপার। তোমাকে সরিয়ে দিচ্ছে ক্ষমতা থেকে, কারণ তোমার নিজের ক্ষমতা নেই। কিন্তু ততদিনে তোমার টাকা পয়সা বেড়ে অনেক হয়ে যাবে। থাকবে অনেক কর্মচারী। বাকি জীবনটা কাটাবে এই ভেবে যে তুমি তোমার লক্ষ্যের পিছুধাওয়া করনি। আর দেরি হয়ে গেছে এতদিনে। অনেক দেরি।

'মনে রেখ। সব সময় মনে রেখ, ভালবাসা কখনো কাউকে লক্ষ্য থেকে সরিয়ে দিতে চায় না। কেউ যদি লক্ষ্য ছেড়ে দেয়, বুঝতে হবে সে ভালবাসা সত্যি নয়... সে ভালবাসা, যা জগতের ভাষায় কথা বলে।'

এবার বালু থেকে বৃত্তটা সরিয়ে দেয় এ্যালকেমিস্ট। চট করে সাপটা চলে যায় আগের জায়গায়। সাথে সাথে সান্তিয়াগোর মনে পড়ে সেই স্ফটিক ব্যবসায়ির কথা যে অহর্নিশি মক্কা যাবার কথা ভাবে। সেই ইংরেজের কথাও মনে পড়ে যে খুজছে এ্যালকেমিস্টকে। সে মেয়ের কথা মনে পড়ে যে বিশ্বাস করে মরুভূমিকে। মনে পড়ে যায় সে মরুভূমির কথা যে এনে দিয়েছে ভালবাসার মেয়েটাকে।

আবার ঘোড়ায় চড়ে তারা। এবার এ্যালকেমিস্টকে অনুসরণ করে ছেলেটা। ফিরে যাচ্ছে মরুদ্যানে। সেখানকার কলরব তুলে আনে হু হু করে বয়ে যাওয়া বাতাস। কান পেতে আছে সান্তিয়াগো। কান পেতে আছে ফাতিমার কণ্ঠ শোনার জন্য।

'আমি তোমার সাথে যাচ্ছি।' অবশেষে বলে সে। কোথেকে যেন হুড়মুড় করে শান্তি এসে ভরিয়ে দেয় তার বুক।

মাত্র একটা কথাই বলে এ্যালকেমিস্ট।

'আমরা কাল সূর্যোদয়ের আগে রওনা দিচ্ছি।'

সারারাত ঘুম হয়নি তার। ভোরের ঘন্টা দুয়েক আগে পাশে শোয়া আরেক ছেলেকে জাগিয়ে ফাতিমার থাকার জায়গার কথা জিজ্ঞেস করে।

ফাতিমার তাবুর কাছে যাবার পর ছেলেটাকে সোনার একটা টুকরা দেয়, যা দিয়ে অবলীলায় কিনে ফেলা যাবে একটা ভেড়া।

এবার যেতে বলে ফাতিমার তাবুতে। তাকে জাগাতে হবে। বলতে হবে বাইরে অপেক্ষা করছে সান্তিয়াগো। আবার কথামত কাজ করে তরুণ আরব। আবার তাকে আরো একটা ভেড়া কেনার মত টাকা দেয় ছেলেটা।

'এবার আমাদের একা থাকতে দাও।'

চলে যায় ছেলেটা। গর্বে বুক ফুলে উঠেছে, কারণ সে উপদেষ্টাকে সাহায্য করেছে। কারণ সে পেয়েছে কয়েকটা ভেড়া কিনে নেয়ার মত স্বর্ণ।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে ফাতিমা। দুজনে মিলে চলে যায় খেজুর বাগানের কাছে। সান্তিয়াগো জানে, নিয়ম ভাঙা হচ্ছে। হোক। এখন এসবে কিছু এসে যায় না।

'চলে যাচ্ছি,' বলে সে অবশেষে, 'তোমাকে জানিয়ে রাখি, ফিরে আসব। আর ভালবাসি কারণ...'

'কোন কথা বলোনা। কেউ ভালবাসা পায় কারণ সে ভালবাসা পায়। ভালবাসার জন্য কোন কারণ দর্শানোর দরকার নেই।'

কিন্তু একগুয়ের মত বলেই চলেছে ছেলেটা, 'স্বপ্নের পর দেখা হল এক রাজার সাথে। তারপর বিকিকিনি করেছি অনেক স্ফটিক, পেরিয়ে এসেছি তেপান্তর। তারপর যুদ্ধ ঘোষণা করল গোত্রগুলো। আমি এ্যালকেমিস্টের খোজে সব চষে ফেলে অবশেষে গেলাম কুয়ার ধারে। আর, তোমাকে ভালবাসি কারণ পুরো সৃষ্টি জগত ফিসফিস করে। ফিসফিস করে তোমাকে আমার করে পাইয়ে দিতে।'

জড়িয়ে ধরে তারা পরস্পরকে। এই প্রথম স্পর্শ করল।

'ফিরে আসব কিন্তু!' বলে ছেলেটা।

'এর আগে আমি শূণ্য অনুভূতি নিয়ে তাকিয়ে থাকতাম মরুর দিকে।' বলে ফাতিমা, 'এখন সেখানে থাকবে আশা। বাবাও চলে গিয়েছিল একদিন। তারপর ফিরে এসেছিল মায়ের কাছে। তারপর যতবার গেছে ততবারই ফিরে এসেছে।'

আর কোন কথা নেই। দুজনেই ঘুরে বেড়ায় গাছের নিচে। তারপর ছেলেটা ফাতিমাকে এগিয়ে দেয় তাবুর কাছে।

'ফিরে আসব আমি। ফিরে আসব তোমার বাবা যেমন তোমার মায়ের কাছে ফিরে এসেছিলেন, সেভাবে।' বলে সান্তিয়াগো।

তারপর চাঁদের ম্লান আলোয় সে দেখে, ফাতিমার চোখে অশ্রু।

'তুমি কাঁদছ?'

'আমি মরুর দেশের মেয়ে,' চোখ মুছতে মুছতে বলে সে, 'এবং আমি একটা মেয়ে।'

পরদিন পানি আনতে গিয়েছিল ফাতিমা। সেখানে কেউ অপেক্ষা করছে না। এখানে আছে পঞ্চাশ হাজার গাছ। আছে তিনশ কুয়া। আছে হজযাত্রিদের আনাগোনা, ব্যবসার ব্যস্ততা, যুদ্ধের ডামাডোল। সব আছে, তবু শূণ্য মনে হচ্ছে এই মরুদ্যানটাকে।

এখন থেকে মরুভূমির দিকে তাকানোর পালা। তাকানোর পালা আকাশের দিকে। কোন তারাটা অনুসরণ করবে সান্তিয়াগো? সে অপেক্ষা করছে। এক নারী অপেক্ষা করছে তার সাহসি পুরুষের জন্য।

'পিছনে ফেলে আসা কোন ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিও না।' ঘোড়ার পিঠে চড়া শুরু করার সময় বলে উঠেছিল এ্যালকেমিস্ট, 'ভুবনের রুহে সব লেখা আছে। থাকবে সব সময়ের জন্য।'

'লোকে কিন্তু চলে যাবার কথা বেশি ভাবে না, ভাবে ঘরে ফেরার কথা।'

'কেউ যদি খাটি পদার্থে তৈরি কিছু পায়, তা কখনো ক্ষয়ে যাবে না। যে কোন কিছু সব সময় ফিরে আসতে পারে। কিন্তু সে ফিরে আসাটা কোন বেশে তা খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

লোকটা এ্যালকেমির ভাষায় কথা বললেও যা বোঝার বুঝে নেয় ছেলেটা।

পিছনে ফেলে আসা ব্যাপারগুলো ভুলে যাওয়া খুব কঠিন। মরুদ্যানে অনেক কিছু ফেলে এসেছে সে। অনেককে। হয়ত এ এ্যালকেমিস্ট কখনো ভালবাসেনি, ভাবে ছেলেটা।

সামনে চড়ে বসে এ্যালকেমিস্ট। কাধে তার পুরনো বন্ধু বাজপাখি। মরুর ভাষা ভালই বোঝে বাজটা। একটু থামলেই এক চক্কর ঘুরে আসে চারধারে। প্রথমদিন এনেছিল একটা ইদুর। পরদিন একজোড়া পাখি।

রাতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে সাবধানে আগুন নিভিয়ে দেয় তারা, হোক শীত, থাকুক চাঁদ ক্ষীণ হয়ে যাবার ফলে আসা অন্ধকার। দিনের বেলায় চলে টগবগিয়ে। কথা বলে শুধু যুদ্ধ এড়িয়ে কীভাবে যাওয়া যায় সে বিষয়ে। সামনে চলার সময় বাতাসে ভর করে ভেসে আসে রক্তের মিষ্টি গন্ধ। ধারেকাছেই কোথাও যুদ্ধ হয়েছিল। এসবই লক্ষণ।

সপ্তম দিনের কথা। এ্যালকেমিস্ট আগেভাগেই আজকের মত থেমে যাবার বন্দোবস্ত করতে চায়। বাজপাখি উড়ে যাবার পর নিজের ভাগ থেকে ছেলেটাকে একটু পানি সাধে সে।

'তোমার যাত্রার শেষপ্রান্তে চলে এসেছ,' এ্যালকেমিস্ট বলছে, 'লক্ষ্যের পিছুধাওয়া করায় অভিনন্দন।'

'কিন্তু সারা পথে আমাকে কিছুই বলোনি তুমি। আমি মনে করেছিলাম রসায়নের কিছু কিছু ব্যাপার শিখাবে। কিছুদিন আগে এ্যালকেমির উপর তাল তাল বই আছে এমন এক লোকের সাথে মরুভূমি পার হয়েছিলাম। কিন্তু বই দেখে কিছু বুঝিনি।'

'শিখার একটাই পথ,' জবাব দেয় এ্যালকেমিস্ট, 'কাজের মাধ্যমে। যাত্রাপথে যা জানার সব জেনে গেছ। আর একটা ব্যাপার বাকি।'

ছেলেটা উসখুস করছে জানার জন্য। এদিকে এ্যালকেমিস্ট তাকিয়ে আছে দূর দিগন্তে, বাজপাখির খোজে।

'তোমাকে এ্যালকেমিস্ট বলে কেন লোকে?'

'কারণ আমি তাই।'

'তাহলে আর সব এ্যালকেমিস্ট কেন সোনা বানাতে পারে না?'

'তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য স্বর্ণ,' জবাব দিল সফরসঙ্গি, 'তারা তাদের লক্ষ্যের গুপ্তধন খুজে যাচ্ছে, লক্ষ্য নিয়ে বাচার চেষ্টা করছে না।'

'আমার আর কী জানা এখনো বাকি?' কথা তোলে ছেলেটা।

কিন্তু দিগন্তে তাকিয়ে আছে এ্যালকেমিস্ট। ফিরে আসছে পাখিটা শিকার নিয়ে। তারা মরুর বুকে গর্ত খোড়ে। তারপর সেখানে আগুন জ্বালায় যাতে বাইরে থেকে শিখা না দেখা যায়।

'আমি একজন এ্যালকেমিস্ট, কারণ আমি এ্যালকেমিস্ট। বিজ্ঞানটা শিখেছিলাম দাদার কাছে, সে শিখেছিল তার বাবার কাছে। এভাবে চলে গেছে ভুবন সৃষ্টির শুরুতে। তখনকার দিনে মাস্টার ওয়ার্কের কথা লেখা যেত শুধু এ্যামারান্ডের বুকে। কিন্তু মানুষ সরল ব্যাপারগুলোকে বাদ দিয়ে লেখা শুরু

করল বিস্তারিত। শুরু করল অনুবাদ, দর্শন। তারা মনে করতে শুরু করল, অন্যদের থেকে ভাল জানে। এদিকে সেই আসল এ্যামারল্ড কিন্তু নষ্ট হয়নি।'

'এ্যামারান্ডে কী লেখা ছিল?'

সাথে সাথে বলিতে আকা শুরু করল এ্যালকেমিস্ট। কাজটা ফুরিয়ে যায় মিনিট পাঁচেকের মধ্যে। এ অঙ্কন দেখে ছেলেটার মনে পড়ে সেই নগর চত্বরের কথা, মনে পড়ে রাজার কথা। যেন কত যুগ আগের ঘটনা!

'এটুকুই লেখা ছিল এ্যামারান্ডে।'

সাথে সাথে লেখাটা পড়ার চেষ্টা করে সান্তিয়াগো।

'এটাতো কোড!' অখুশি হয় সে, 'এমনি একটা লেখা ছিল ইংরেজ লোকটার বইয়ে।'

'না।' জবাব দেয় এ্যালকেমিস্ট, 'এ হল ঐ শিকারি পাখি দুটার উড়ে যাবার মত। শুধু কারণ দিয়ে বোঝা যাবে না। সেই এ্যামারান্ডের টুকরা আসলে ভুবনের আত্মার প্রতি সোজা এক পথ।

'জ্ঞানী লোকটা বুঝতে পেরেছিলেন যে আসলে এ প্রাকৃতিক পৃথিবী স্বর্গের প্রতিচ্ছবি ছাড়া আর কিছু নয়। এ ভুবনের অস্তিত্বের মানে এমন কোন ভুবন আছে যা একেবারে নিখুত। ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এজন্য যে, এর দৃশ্যমান জিনিসের ভিতর দিয়ে মানুষ আসলে তার আত্মিক শিক্ষা আর অসাধারণ সৃষ্টির ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। আমি আসলে ঠিক সে ব্যাপারটাই বোঝাতে চাচ্ছি।'

'আমার কি এ্যামারল্ডের টুকরাটা বোঝা উচিত?'

'হয়ত। তুমি এ্যালকেমির ল্যাবরেটরিতে থাকলে পারা উচিত ছিল, তাহলে ঠিক এখন তুমি বুঝে যেতে এ্যামারান্ডের গূঢ় তত্ত্ব। কিন্তু তুমিতো সেখানে নেই। আছ মরুভূমিতে। আর মরুভূমির বুকেও লুকিয়ে আছে সেটা। তোমাকে পুরো মরুভূমি ছানতে হবে না। স্রেফ একটা বালুকণা নাও। তারপর সেটাকে বিশ্লেষণ কর। সৃষ্টির বিস্ময় চিনে ফেলবে এক পলকে।'

'আমি মরুভূমির বুকে নিজেকে মানিয়ে নিব কী করে?'

'তোমার হৃদয়ের কথা শোন। সে সব জানে, কারণ, এসেছে ভুবনের আত্মার কাছ থেকে। একদিন ফিরে যাবে সেখানেই।'

নিরবে আরো দুদিন তারা এগিয়ে যায়। এখন খুব সাবধান থাকে এ্যালকেমিস্ট। সর্বক্ষণ চোখকান খোলা রাখে। এ এলাকায় সবচে ভয়ানক যুদ্ধগুলো হচ্ছে।

এগিয়ে যাবার সাথে সাথে হৃদয়ের কথা শোনার চেষ্টা করে ছেলেটা।

কাজটা মোটেও সহজ নয়, আগেকার দিনে হৃদয় সব সময় কাহিনী শোনাতে প্রস্তুত ছিল, পরে আর সে কথা খাটে না। মাঝে মাঝে হৃদয় শুধু দুঃখের কথা শোনায়। কখনো কখনো মরুভূমিতে সূর্যোদয়ের সময় ছেলেটাকে সাবধানে চোখের পানি লুকাতে হয়।

কষ্টের সময় হৃদপিন্ড ধ্বক ধ্বক করে অনেক বেশি। শান্ত সময়ে থাকে শান্ত। কিন্তু সে কখনো চুপ করে থাকে না।

'আমাদের কেন হৃদয়ের কথা শুনতে হবে?' সেদিন ক্যাম্প করার সময় প্রশ্ন করে বসে ছেলেটা।

'কারণ, হৃদয় যেখানে আছে সেখানেই পাবে গুপ্তধন।'

'কিন্তু হৃদয় তো আমার কথা শোনে না। কোন এক মরুদ্যানের কথা বলে। বলে কোন এক ফেলে আসা মেয়ের কথা।'

'ভালতো! তোমার হৃদয় বেচে আছে। শোনার চেষ্টা কর অষ্টপ্রহর।'

পরের তিন দিনে দুজন সশস্ত্র মানুষের পাশ দিয়ে যায়। দূরপ্রান্তে দেখে আরেক দল। এখন ছেলেটার হৃদয় ভয়ের কথা বলছে। সে বলছে ভুবনের আত্মার কাছ থেকে জানা কথা। এমন সব লোকের কথা বলছে যারা গুপ্তধনের খোজে বেরিয়ে আর কখনো ফিরে আসেনি; এমনকি সফলও হয়নি। অন্য সময় শোনায় তুষ্টির কথা। আনন্দের কথা।

'আমার হৃদয় দেখি দারুণ বিশ্বাসঘাতক,' এ্যালকেমিস্টকে উদ্দেশ্য করে গলা চড়ায় ছেলেটা ঘোড়াগুলোকে একটু বিশ্রাম দিতে থামার সময়, 'এগিয়ে যেতে দিতে চায় না।'

'বুঝতেই পারছ।' সাফ জবাব এ্যালকেমিস্টের।

'তাই বলে বেড়াচ্ছে যে তুমি স্বপ্নের পিছুধাওয়া করতে গিয়ে সব খুইয়ে বসতে পার।'

'তাহলে আমার মনের কথা শোনার দরকার কী?'

'কারণ আর কখনো তাকে চুপ করিয়ে রাখতে পারবে না। চাও বা না চাও, সে তোমাকে নানা কথা বলেই যাবে। বলে যাবে তোমার মনের অবস্থার ব্যাপারে।'

'তার মানে বিশ্বাসঘাতকতা করলেও আমাকে শুনে যেতে হবে?'

'বিশ্বাসঘাতকতা হঠাৎ করে আসে। তুমি যদি হৃদয়ের কথা শোন, তাহলে বুঝতে পারবে, সে কখনো তা করতে পারছে না। কারণ তুমি স্বপ্ন আর ইচ্ছার কথা জান, জান কী করে তা সত্যি করতে হয়।

'হৃদয়ের কাছ থেকে কখনো চলে যেতে পারবে না বলেই যা বলছে শুনে যাওয়া ভাল। তখন অপ্রত্যাশিত আঘাতের হাত থেকে রক্ষা পাবে।'

এক বিকালে ছেলেটার হৃদয় জানিয়ে দেয়, সে সুখি। সাথে সাথে পিছুটান হয়ে পড়ে দুর্বল। 'মাঝে মাঝে আমি নানা অভাব অভিযোগ তুলি,' বলে সেটা, 'কারণ আমি কোন একজনের হৃদয়। লোকে স্বপ্নের পিছুধাওয়া করতে চায় না কারণ সব মানুষের হৃদয় একই রকম। আর সে ভয় পায় বেশি। প্রিয়জনকে হারানোর ভয়। এদিকে স্বপ্নের পিছুধাওয়া না করলে সারা জীবনের জন্য তা তলিয়ে যেতে পারে বালির নিচে। তখন আমরা খুব ভুগি।'

'তাহলে, আমার হৃদয় ভোগান্তির ভয় পায়,' সে চাঁদহীন নিকষ কালো অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে এক রাতে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলে এ্যালকেমিস্টকে।

'হৃদয়কে জানিয়ে দাও, ভোগান্তির ভয় আসল ভোগান্তিরচে কষ্টকর। আর স্বপ্নের পথে কাজ করে যেগুলো, সেগুলোর কোন ভোগান্তি নেই, কারণ তারা প্রতি মুহূর্তে ঈশ্বর আর মহাকালের সাথে লেনদেন করে।'

'খোজ চালানোর সময় প্রতিটা মুহূর্ত আসলে ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগের নামান্তর।' নিজের হৃদয়কে বোঝায় ছেলেটা, 'সম্পদ পাবার কথা ভাবলে তখন মনে চলে আসে পাবার আশা। তাই থাকে অনেক আনন্দ।'

সারা বিকাল চুপ করে থাকে হৃদয়। সে রাতে ভাল ঘুম হয় তার। ঘুম থেকে জাগার পর ভুবনের আত্মা থেকে কথা এনে বলতে থাকে হৃদয়, 'মানুষ কাজ করতে থাকলে ঈশ্বর বসত করেন তার ভিতরেই। পৃথিবীর বুকে যত মানুষ আছে তাদের সবার জন্য আছে কোন না কোন গুপ্তধন। আমরা, মানুষের হৃদয়েরা সেসব ব্যাপারে খুব বেশি কিছু বলি না, কারণ লোকে আর সেসবের খোজে বের হবে না। ছেলেবেলায় তাদের সাথে কথা বলি। তারপর বেড়ে চলে বয়স, সেই সাথে বেড়ে যায় আমাদের চুপ করে থাকার সময়। কিন্তু, দুর্ভাগ্যজনকভাবে, খুব কম লোকই তাদের জন্য পাতা পথে পা বাড়ায়। বেশিরভাগ মানুষের কাছে পৃথিবী হল হুমকির জায়গা, আর তাদের বিশ্বাসের কারণেই বেরিয়ে পড়ে জগতের বীভৎস সব রূপ।

'আর তাই, আমরা, তাদের হৃদয়েরা কথা বলি আরো আরো কোমল ভাষায়। কথা বন্ধ করতে পারি না, শুধু আশা করি, সেটা শোনা যাবে না।'

'তাহলে লোকের হৃদয় তাদের স্বপ্নের পথে যাবার কথা বলে না কেন?' না পেরে এ্যালকেমিস্টকে প্রশ্ন করে ছেলেটা।

'কারণ এ একটা পথে সবচে বেশি ভোগান্তি হয়। আর হৃদয়েরা ভোগান্তি পছন্দ করে না।'

তখন থেকেই ছেলেটা হৃদয়ের ব্যাপারগুলো বুঝতে শিখে। জানিয়ে দেয়, লক্ষ্য থেকে দূরে সরে গেলে চাপ দিতে হবে তাকে। চাপ দিতে হবে পথে ফিরিয়ে আনার জন্য।

সে রাতে এ্যালকেমিস্টকে এসব খুলে বলার পর এ্যালকেমিস্ট বুঝতে পারে সান্তিয়াগোর হৃদয় ফিরে গেছে ভুবনের আত্মার কাছে।

'এখন? কী করব আমি?' প্রশ্ন তোলে ছেলেটা।

'এগিয়ে যাবে পিরামিডের দিকে। যথাযথ সম্মান জানাবে লক্ষণগুলোকে। গুপ্তধনটা কোথায় আছে তা জানানোর ক্ষমতা আছে হৃদয়ের। এখনো।'

'এ ব্যাপারটা জানা বাকি ছিল আমার?'

'না।' জবাব দেয় এ্যালকেমিস্ট, 'যা জানতে হবে তা হল, কোন স্বপ্ন বুঝতে পারার আগে বিশ্বের আত্মা আগের সব অভিজ্ঞতার আলোকে যাচাই করে। খারাপ কোন উদ্দেশে নয়, আমরা যেন লক্ষ্যের দিকে ঠিকভাবে চলতে পারি সেজন্য। ঠিক এখানেই হাল ছেড়ে দেয় বেশিরভাগ মানুষ। মরুর ভাষায় আমরা বলি, "খেজুর গাছের সারি চোখে পড়ার পর মারা গেল তৃষ্ণায়"

'সব খোজ শুরু হয় শুরু যে করেছে তার সৌভাগ্যের সাথে। শেষ হয় বিজয়ী বারবার পরীক্ষিত হবার পর।'

ছেলেটারও মনে পড়ে যায় দেশের সেই প্রবাদের কথা। সূর্য উদিত হবার আগের প্রহর সবচে বেশি অন্ধকার।

পরদিন বিপদের গন্ধ টের পায় তারা। তিনজন সশস্ত্র অশ্বারোহী এগিয়ে এল। প্রশ্ন করল ছেলেটা আর এ্যালকেমিস্ট কী করছে।

'বাজ নিয়ে শিকার করছি আমি।' এ্যালকেমিস্টের সাফ জবাব।

'আমরা আপনাদের পরখ করে দেখব। দেখতে হবে কোন অস্ত্র আছে কিনা।' বলে ওঠে একজন।

আস্তে আস্তে নেমে আসে এ্যালকেমিস্ট। ছেলেটাও একই পথ ধরে।

'টাকা নিয়ে যাচ্ছেন কেন?' ছেলেটার ব্যাগ খোজার পর জিজ্ঞেস করে।

'পিরামিডের দিকে যেতে হত, তাই।'

আরেকজন এ্যালকেমিস্টকে পরীক্ষা করে তরল ভরা ক্রিস্টালের একটা ফ্লাস্ক পায়। পায় মুরগির ডিমেরচে সামান্য বড় হলদে ডিম্বাকার একটা কাচ।

'এগুলো কী?'

'ফিলোসফারস স্টোন আর অমৃত। এ্যালকেমিস্টদের মাস্টারওয়ার্ক। একবার এ অমৃত পান করলে কখনো অসুখ হবে না। আর ঐ পাথরের টুকরা থেকে একটু অংশ নিলে যে কোন ধাতুকে স্বর্ণ করে ফেলা যায়।'

এবার আরবরা তাকে নিয়ে তামাশা শুরু করে। সাথে সাথে হেসে ওঠে এ্যালকেমিস্টও। জবাব শুনে ভাল লাগে তাদের, মনে হয় মজা করেছে এ্যালকেমিস্ট। দুজনকেই চলে যেতে দেয়।

'আপনি পাগল নাকি?' যেতে যেতে কথাটা তোলে ছেলেটা, 'কোন দুঃখে করলেন কাজটা?'

'তোমাকে জীবনের এক সাধারণ শিক্ষা দেয়ার জন্য। তোমার ভিতরে অসাধারণ কোন সম্পদ থাকলে তা লোককে বলে বেড়ালে খুব বেশি মানুষ বিশ্বাস করবে না।'

এগিয়ে যায় তারা। যত এগিয়ে যায় তত নিশ্চুপ হয়ে পড়ে ছেলেটার হৃদয়। এখন আর তা খুব বেশি কিছু জানতে চায় না। হৃদয় শুধু ভুবনের আত্মার কাছ থেকে শিখতে থাকে। ছেলে আর তার হৃদয় এখন বন্ধু। বন্ধুরা বিশ্বাসঘাতকতা করে না।

একবার কথা বলে ওঠে হৃদয়। জানায়, মরুভূমির নৈঃশব্দ নিয়ে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। বলে, ছেলেটার সবচে বড় সম্পদ হল, সে সব ভেড়া বিকিয়ে দিয়ে লক্ষ্যের পথ ধরতে পেরেছিল, কাজ করেছিল স্ফটিকের দোকানে।

আরো একটা কথা বলে যা সে কখনো খেয়াল করেনিঃ বাবার কাছ থেকে নেয়া রাইফেলটা হৃদয় লুকিয়ে ফেলেছিল যাতে সে নিজের ক্ষতি করে না ফেলে। আরেকবার আরো একটা কান্ড করে বসে সে। ছেলেটার মনে আছে কিনা জানে না, একবার মাঠের ভিতরেই বমি করে করে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। ব্যাপারটা খারাপ মনে হলেও আসলে পথে অপেক্ষা করছিল দুজন চোর। তারা ছেলেটাকে একেবারে মেরে ফেলে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল ভেড়ার পাল। কিন্তু অজ্ঞান হয়ে থাকায় তার আর সময়মত যাওয়া হয়নি। চোররা ভেবে বসে আছে সে অন্য পথ ধরেছে।

'মানুষের হৃদয় কি সব সময় তাকে সহায়তা করে?' প্রশ্ন তোলে ছেলেটা এ্যালকেমিস্টের কাছে।

'বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শুধু তাদের হৃদয়, যারা লক্ষ্য লক্ষ্য করে এগিয়ে যায়। কিন্তু তারা সব সময় সহায়তা করে বাচ্চাদের, মাতালদের আর বয়েসিদের।'

'তার মানে আমি কখনো হুট করে বিপদে পড়ব না?'

'মানে হল, হৃদয় তাই করে যা পারে।' জানিয়ে দেয় এ্যালকেমিস্ট।

আরেক বিকালে তারা সৈন্যদের তাবুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ঘাটির প্রত্যেক পাশে সাদা আলখেল্লায় সজ্জিত সৈনিক। অস্ত্র তাক করা। কিন্তু তারা যুদ্ধের খোশগল্প আর হুকা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে দুজনকে দেখেনি।

'আর ভয় নেই,' এলাকাটা পেরিয়ে যাবার পর বলে ছেলে।

এবার রেগে ওঠে এ্যালকেমিস্ট, 'তোমার হৃদয়ের উপর বিশ্বাস রাখ, ভুলে যেও না যে আসলে আছ এক মরুভূমির মাঝখানে। লোকে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে পৃথিবীর আত্মা যুদ্ধের চিৎকার শুনতে পায়। এক সূর্যের নিচে কেউ ঘটনার সূত্র থেকে আসা সমস্যার বাইরে নয়।'

সব আসলে একই, ভাবে ছেলেটা। তারপর, মরুভূমির যেন ইচ্ছা হল এ্যালকেমিস্টের কথা সত্যি করে দেখানোর। পিছন থেকে ধেয়ে এল দুজন ঘোরসওয়ার।

'আর যেতে পারবে না তোমরা,' বলল একজন, 'যুদ্ধক্ষেত্রে আছ এখন।'

'খুব বেশি দূরে যাচ্ছি না।' জবাব দিল এ্যালকেমিস্ট, সেই লোকটার চোখে চোখে তাকিয়ে। তারা চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর জানায়, যেতে পারবে।

'তুমি চোখের দৃষ্টি দিয়ে ঘোরসওয়ারদের কুপোকাৎ করে দিয়েছ! যেভাবে তাকিয়েছ তাকেই তাদের দৃষ্টিরচে তোমার দৃষ্টির প্রখরতা বেশি মনে হয়।' বলল ছেলেটা অবাক হয়ে।

'চোখ আসলে আত্মার শক্তি প্রদর্শন করে।'

আসলেই, অনুভব করে ছেলেটা, সেই প্রহরীদের মধ্যে একজন এত দূর থেকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে।

অবশেষে পুরো দিগন্তজুড়ে হাজির হয়েছে পর্বতমালা। পিরামিডে যেতে আর মাত্র দুদিন বাকি।

'আমরা যদি আলাদা পথে সরে যাই,' বলে ছেলেটা, 'তাহলে আমাকে এ্যালকেমি থেকে কিছু শিক্ষা দাও।'

'তুমি এর মধ্যেই এ্যালকেমি শিখে গেছ। ব্যাপারটা হল, বিশ্বের আত্মার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করতে হবে, তারপর আবিষ্কার করতে হবে ভিতরে তোমার জন্য রাখা সম্পদটুকু।'

'না, তা বলছি না। শীসাকে সোনায় রূপান্তরের কথা বলছি।'

মরুভূমির মত চুপ হয়ে যায় এ্যালকেমিস্ট। খাবার জন্য থামার পর জবাব দেয়।

'সৃষ্টি জগতের সবকিছুই আসলে তৈরি হয়েছে, আর জ্ঞানীদের জন্য সবচে বেশি বেড়েছে যেটা তা হল স্বর্ণ। কেন? জিজ্ঞেস করোনা। জানি না আমি। শুধু জানি, ঐতিহ্য সব সময় ঠিক।

'মানুষ কখনো জ্ঞানীদের কথা বোঝে না। তাই বিবর্তনের একটা ধারা হিসাবে প্রকাশ পাবে স্বর্ণ, তা না, প্রকাশ পেল সংঘাতের মূলসূত্র হিসাবে।'

'কিন্তু জিনিসেরা নানা ভাষায় কথা বলে,' বলল ছেলেটা, 'এককালে আমার কাছে উটের ডাক সামান্য এক ডাক ছাড়া আর কিছু ছিল না। পরে এটাই হয়ে উঠল বিপদের গন্ধ। সবশেষে আবার সামান্য এক ডাক।'

তারপর সে চুপ হয়ে যায়। এসব কথা এ্যালকেমিস্টের অজানা নয়।

'আমি সত্যিকার এ্যালকেমিস্টদের চিনতাম,' বলে এ্যালকেমিস্ট, 'তারা নিজেদের সর্বক্ষণ ল্যাবরেটরিতে আবদ্ধ করে রাখে, চায় স্বর্ণের মত বিবর্তিত হতে। তার পরই তারা আবিষ্কার করে ফিলোসফারস স্টোন। কারণ যখন কোনকিছু বিবর্তিত হয়, বিবর্তিত হয় আশপাশের সবকিছু নিয়ে।

'বাকিরা হঠাৎ করে পরশ পাথরের সন্ধান পেয়েছে। আগেভাগে পেয়ে বসেছিল উপহারটা। কিন্তু তাদের আত্মা অন্যদের আত্মারচেও বেশি দামি কিছুর অপেক্ষা করছে। এমনধারা লোক পাওয়া খুব মুশকিল।

'আরো এক ধরনের এ্যালকেমিস্ট আছে। তাদের একমাত্র কামনা স্বর্ণ। কখনো পায়নি রহস্যের সন্ধান। ভুলে গেছে যে সীসা, তামা আর লোহাকে তাদের নিজ নিজ লক্ষ্য পূরণ করতে হবে। আর যখন কেউ অন্যের লক্ষ্যে হস্ত ক্ষেপ করে তারা কখনো নিজেরটুকু পূরণ করতে পারে না।'

বাতাসে বাতাসে এ্যালকেমিস্টের কথাটুকু অভিসম্পাতের মত ধ্বণিত প্রতিধ্বণিত হয়। এগিয়ে যায় তারা সামনে। মাটি থেকে কুড়িয়ে নেয় একটা খোলস।

'এ মরুভূমি আসলে এককালে সাগর ছিল।' বলে সে।

'খেয়াল করেছি।'

কানের উপর খোলসটা বসিয়ে নিতে বলে এ্যালকেমিস্ট। ছেলেবেলায় এমন কাজ অনেকবার করেছে সে। শুনেছে সাগরের ডাক।

'এই সামান্য খোলের ভিতরে বেচে আছে সমুদ্র। কারণ এটাই তার লক্ষ্য। এখানে আবার সাগর আসা পর্যন্ত এ শব্দ চলতেই থাকবে।'

তারা উঠে বসে ঘোড়ার উপরে। তারপর যেতে থাকে মিশরের পিরামিডের দিকে।

মনে বিপদের কথা আসার সময় সূর্য ডুবে যাচ্ছিল। হঠাৎ ছেলেটা টের পায়, চারপাশে বিশাল সব বালির ঢিবি। এ্যালকেমিস্ট খেয়াল করেছে নাকি ব্যাপারটা? কিন্তু তাকে একটুও বিচলিত মনে হয় না। পাঁচ মিনিট পর দেখা গেল সামনের ঢিবিতে অপেক্ষা করছে দুজন ঘোরসওয়ার। এ্যালকেমিস্টের উদ্দেশে কিছু বলার আগে তাদের সংখ্যা দাড়ায় দশজনে। তারপর একশ। তারপর ঢিবির চারপাশে।

এ গোত্রের মানুষ নীল জামা পরে যুদ্ধ করতে নেমেছে। মুখও নীল পর্দায় ঢাকা, খোলা আছে শুধু চোখজোড়া।

এত দূর থেকেও তাদের চোখের স্থির সঙ্কল্প ধরা যায়। সেখানে মৃত্যুর ছায়া আকা।

দুজনকে নিয়ে যাওয়া হল কাছের সামরিক ঘাটিতে। নিয়ে গেল সেনাপতির তাবুতে। সেনাপতি তার দলবল নিয়ে আলোচনা করছিল।

'এরাই গুপ্তচর।' বলল একজন।

'আমরা শুধু ভ্রমণকারী,' জবাব দিল এ্যালকেমিস্ট।

'তিন দিন আগে তোমাদেরকে শত্রু ক্যাম্পে দেখা গেছে। তাদের একজনের সাথে কথা বলছিলে তুমি।'

'আমি শুধু মরুর বুকে ঘুরে বেড়ানো আর আকাশ পর্যবেক্ষণ করা এক লোক। আমার কাছে সৈন্যদল বা গোত্রের কোন খবর পাওয়া যাবে না। বন্ধুর সফরসঙ্গি হিসাবে কাজ করছিলাম।'

'তোমার বন্ধুটা কে?' প্রশ্ন করল সেনাপতি।

'একজন এ্যালকেমিস্ট,' এ্যালকেমিস্ট বলছে, 'যিনি প্রকৃতির শক্তি বোঝেন। আপনাদের দেখাতে চান তার অলৌকিক ক্ষমতা।'

শান্ত হয়ে কথাগুলো শুনে যায় ছেলেটা। শুনে যায় ভয়ার্তভাবে।

'এ এলাকায় বিদেশি কী করছে?' প্রশ্ন করল আরেকজন।

'আপনাদের গোত্রে দেয়ার জন্য টাকা নিয়ে এসেছেন তিনি।' ছেলেটাকে কোন কথা বলার সুযোগ দেয় না এ্যালকেমিস্ট। হাত থেকে ব্যাগ তুলে নিয়ে দেখায় স্বর্ণমুদ্রাগুলো।

কোন কথা ছাড়াই সেগুলো নিয়ে নেয় আরব। এ দিয়ে অনেক অস্ত্র কেনা যাবে।

'এ্যালকেমিস্ট কী?' প্রশ্ন করে অবশেষে।

'এমন এক মানুষ যিনি প্রকৃতিকে বোঝেন, বোঝেন বিশ্বকে। চাইলে তিনি শুধু বাতাসের শক্তি দিয়ে এ ঘাটি তছনছ করে দিতে পারতেন।'

হেসে ফেলল লোকগুলো।

তারা যুদ্ধের কানাঘুষা সম্পর্কে ভালভাবেই জানে। জানে, এ ঘাটি তছনছ করার মত বাতাস ওঠার তেমন কোন সম্ভাবনা নেই। তার পরও, সবার হৃদস্পন্দন কেমন যেন বেড়ে গেছে। তারা মরুর দেশের মানুষ, জাদুকরদের ভয় পায়।

'আমি চাই তিনি তা করে দেখাবেন।' সেনাপতি বলল।

'তিনদিন সময় লাগবে।' বলল এ্যালকেমিস্ট, 'প্রথমে তিনি নিজেকে বাতাসে রূপান্তরিত করবেন, শুধু ক্ষমতা দেখানোর জন্য। আর যদি তা করতে না পারেন তাহলে আমাদের জীবন সমর্পণ করছেন আপনাদের গোত্রের সম্মানে।

'আমার হয়ে গেছে এমন কিছু তুমি আমার কাছে সমর্পণ করতে পার না,' রাজকীয়ভাবে বলল সেনাপতি। সেইসাথে তিনদিন সময় মঞ্জুর করল।

ভয়ে পাতার মত কাপছে ছেলেটা। হাতে ধরে তাকে বাইরে নিয়ে আসে এ্যালকেমিস্ট।

'ভয় পাবার কথা কিছুতেই বুঝতে দিও না,' এ্যালকেমিস্ট বলল, 'তারা সাহসী, ভিতুদের ঘৃণার চোখে দেখে।'

কিন্তু ছেলেটার কথা বলার সাহসটুকুও নেই। ঘাটির মাঝামাঝি জায়গা ছেড়ে যাবার পর কথা ফুটল মুখে। তাদের বন্দি করে রাখার কোন দরকার নেই। সোজা ব্যাপার, ছিনিয়ে নিয়েছে ঘোড়াগুলো। তাই, আবারো পৃথিবী তার বিচিত্র ক্ষমতার প্রকাশ দেখায়। একটু আগেও মরুভূমি ছিল খোলা, বিশাল। এখন নিশ্চিদ্র এক দেয়াল।

'আমার সমস্ত সম্পদ দিয়ে দিলে তাদের!' প্রশ্ন করে ছেলেটা, 'আমার জীবনের সমস্ত সম্পদ!'

'আচ্ছা! তাহলে মরে গেলে সেগুলো কোন কাজে লাগত? তোমার টাকাটা আমাদের জীবন আরো তিন দিনের জন্য বাঁচিয়ে দিয়েছে। টাকা কিন্তু সব সময় প্রাণ বাচাতে পারে না।'

কিন্তু ছেলেটা এত ভয় পেয়ে গেছে যে জ্ঞানের কথা শোনার মত অবস্থা নেই। কী করে যে নিজেকে বাতাসে রূপান্তরিত করবে কে জানে! আর যাই হোক, সে এ্যালকেমিস্ট নয়!

এক প্রহরীকে একটু চা আনতে বলল এ্যালকেমিস্ট। তারপর ঢালল ছেলেটার কব্জিতে। কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করল যার কিছুই বুঝতে পারে না ছেলেটা।

'ভয়ের কাছে মাথা পেতে দিও না,' এ্যালকেমিস্ট বলছে খুব সহজ ভাষায়, 'দিলে হৃদয়ের সাথে আর কথা বলতে পারবে না।'

'কিন্তু নিজেকে কীভাবে বাতাস বানিয়ে ছাড়ব তাতো বুঝতে পারলাম না।'

'কোন মানুষ লক্ষ্য নিয়ে জীবন কাটালে সে প্রয়োজনীয় প্রতিটা ব্যাপার জানে। স্বপ্নকে অসম্ভব করে তোলে মাত্র একটা ব্যাপার: ব্যর্থ হবার ভয়।'

'আমি ব্যর্থ হবার ভয় পাচ্ছি না। সমস্যা হল, কী করে নিজেকে বাতাস বানিয়ে নিতে হয় সে সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।'

'শিখতে হবে। জীবন নির্ভর করছে এর উপর।'

'আর যদি না পারি?'

'তখন তুমি লক্ষ্য বুঝতে শুরু করে মাঝপথে মারা যাবে। তবু ভাল, আরো কোটি মানুষের মত জীবনের লক্ষ্য কী সেটা না জেনে মরবে না।

'কিন্তু চিন্তা করোনা,' আশ্বাস দেয় এ্যালকেমিস্ট , 'সাধারণত মৃত্যুর হুমকি মানুষের মনে বেচে থাকার আশা বাড়িয়ে তোলে।'

কেটে গেছে প্রথম দিন। সাঙ্ঘাতিক এক যুদ্ধ হয়েছে কাছে কোথাও। অনেকে আহত হয়ে ফিরে এসেছে। মৃতদের জায়গা দখল করে নিয়েছে জীবিতরা। ছেলেটা ভাবে, মৃত্যু আসলে কিছু বদলে দেয় না।

'তোমরা আরো পরে মারা যেতে পারতে,' এক সৈনিক মৃতদেহগুলোর পাশে বলছে, 'মারা যেতে পারতে শান্তি ঘোষিত হবার পর। কিন্তু যাই হোক না কেন, তোমাদের ভাগ্যে মৃত্যুই লেখা ছিল।'

দিনের শেষে বেরিয়ে পড়ে ছেলেটা। বাজ নিয়ে শিকারে গিয়েছিল এ্যালকেমিস্ট।

'আমি এখনো মাথামুন্ডু কিছু বুঝছি না, কী করে নিজেকে বাতাসে পরিণত করব!' আবার বলে যায় সে।

'কী বলেছি মনে আছে তো? পৃথিবী আসলে ঈশ্বরের দৃশ্যমান অংশ। এ্যালকেমিস্টের কাজ হল বস্তুজগতে অলৌকিকের ছোয়া আনা।'

'কী করছ তুমি?'

'বাজটাকে খাওয়াচ্ছি।'

'আমি নিজেকে বাতাসে পরিণত করতে না পারলে মরতে হবে,' বলে সে নাছোড়বান্দার মত, 'আর তুমি বাজপাখিকে খাওয়াচ্ছ?'

'মারা গেলে তুমি যাবে,' বলে এ্যালকেমিস্ট, 'কী করে নিজেকে বাতাসে পরিণত করতে হয় তা আমি ভালভাবেই জানি।'

দ্বিতীয় দিন ছেলেটা ঘাটির কাছে এক পাথুরে উচু জায়গায় ওঠে। প্রহরীরা কোন বাধা দেয়নি। এর মধ্যেই শুনে বসে আছে যে এমন এক জাদুকর এসেছে এখানে যে লোকটা নিজেকে হাওয়ায় মিলিয়ে দিতে জানে। তাকে ঘাটানোর সাহস নেই কারো। মরুভূমি বড় বিচিত্র জায়গা। এখানে সব সম্ভব।

দ্বিতীয় দিনের পুরো বিকাল কেটে যায় মরুভূমির দিকে তাকিয়ে থেকে। নিজের হৃদয়ের কথা শুনে শুনে। ছেলেটা জানে, মরুভূমি তার ভয়ের ব্যাপারটা আচ করতে পেরেছে।

তারা দুজনে একই ভাষায় কথা বলে।

তৃতীয় দিন।

আর সব অধিনায়কের সাথে দেখা করে সেনাপতি। এ্যালকেমিস্টকে ডাকে সভায়। তারপর বলে, 'চল, সেই ছেলেটার সাথে দেখা করা যাক যে নিজেকে বাতাসে মিলিয়ে ফেলতে পারে।'

'চল।' সুর মিলায় এ্যালকেমিস্ট।

আগেরদিন যেখানে সময় কাটিয়েছে, সেই পাথরচূড়ায় সবাইকে নিয়ে যায় ছেলেটা। বসতে বলে সবাইকে।

'সময় লাগবে একটু।'

'আমাদের কোন তাড়া নেই,' জবাব দেয় সেনাপতি, 'আমরা মরুর দেশের লোক।'

ছেলেটা দিগন্তে তাকায়। দূর দিগন্তে অনেক পাহাড় আছে। আছে বালির বিশাল বিশাল ঢিবি, পাথরের চাই, আর আছে ছোটখাট ঝোপঝাড়। যেখানে জীবন ধারনের সামন্যতম উপকরণ, সেখানেই প্রাণ। এ মরুভূমির কথা বহু মাস ধরে তার মনে ছিল; এতকিছুর পরও সে এর খুব সামান্য অংশ চিনতে পেরেছে। সে সামান্য অংশে দেখা দেখেছে এক ইংরেজকে। দেখেছে মরুবহর, গোত্রযুদ্ধ আর পঞ্চাশ হাজার গাছ ও তিনশ কুয়া ওয়ালা এক আস্ত মরুদ্যান।

'আজ কী চাও তুমি?' প্রশ্ন করে ধূ ধূ বালুকাবেলা, 'কাল কি চেয়ে থেকে অনেক সময় কাটাওনি?'

'তোমার কোথাও লুকিয়ে আছে আমার ভালবাসার মানুষ,' বলে ছেলেটা, 'তাই যখন তোমার বালির দিকে তাকাই, যেন তাকাই তার দিকেই। আমাকে তার কাছে ফিরে যেতে হবে। নিজেকে বাতাসে পরিণত করার জন্য তোমার সহায়তা দরকার।'

'ভালবাসা কী?' প্রশ্ন করে মরুভূমি।

'তোমার বালুর উপর দিয়ে বাজ পাখির উড়ে যাওয়া হল ভালবাসা। কারণ তার জন্যই তুমি সবুজ প্রান্তর, যেখান থেকে সে ফিরে আসে খেলা শেষে। সব সময়। সে তোমার পাথরগুলো চেনে, চেনে বালির ঢেউ, সব পাহাড়। এসব কারণে তুমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

'বাজপাখি আমার খুব বেশি উপকার করে না,' সাথে সাথে জবাব দেয় মরুভূমি, 'বছরের পর বছর ধরে তার খেলার সাথি হই আমি, সামান্য যা পানি আছে তা পান করাই, তারপর দেখিয়ে দিই খেলার অবস্থান। তারপর একদিন হঠাৎ টের পাই, আমার বালির উপর তার খেলে যাওয়ার পর সে তীব্র বেগে উপরে তুলে নিয়ে যায় যা তৈরি করেছি আমি নিজে।'

'আর সে কারণেই তুমি তৈরি করেছ খেলাটা,' জবাব দেয় ছেলে, 'বাজপাখিকে পুষ্ট করার জন্য। তখন বাজ পুষ্ট করে মানুষকে। মানুষ আস্তে আস্তে পুষ্ট করবে তোমার বালুময় প্রান্তর। এভাবে আবার শুরু হবে খেলা। এভাবেই চলে পুরো জগত।'

'তাহলে এই হল ভালবাসা?'

'হ্যা। এই হল ভালবাসা। এভাবেই চক্র পূর্ণ হয়। সীসা পরিণত হয় স্বর্ণে, স্বর্ণ চলে যায় মাটির গভীরে।'

'জানি না কী কথা বলছ।' বলে ওঠে মরুভূমি।

'কিন্তু তুমি এটুকু বুঝতে পার যে সেখানে, বালির ভিতরে কোথাও এক মেয়ে আমার অপেক্ষায় বসে আছে। আর সেজন্য আমার নিজেকে বাতাসে পরিণত করা দরকার।'

কিছুক্ষণ কোন জবাব আসে না মরুভূমির পক্ষ থেকে।

তারপর বলে ওঠে, 'আমি বালি পাঠাতে পারি, যেন বাতাস বয়। এর বেশি কিছু করতে পারব না। বাকিটার জন্য তোমাকে বাতাসের কাছে যেতে হবে।'

মৃদুমন্দ বাতাস উঠছে। দূর থেকে ছেলেটাকে দেখছে গোত্রের লোকজন। এমন ভাষায় কথা বলছে নিজেদের মধ্যে যার কিছুই বুঝতে পারে না ছেলেটা।

মৃদু হাসি এ্যালকেমিস্টের ঠোঁটে।

বাতাস এগিয়ে এল। স্পর্শ করল ছেলেটার মুখ। এটা মরুভূমির সাথে ছেলেটার কথা বলার ব্যাপার জানে। কারণ বাতাসেরা সব শুনতে পায়। কোন জন্মভূমি ছাড়াই ভেসে বেড়ায় সারা দুনিয়াজুড়ে। তারপর তাদের মৃত্যুর কোন স্থান নেই।

'সহায়তা কর,' বলে ছেলেটা, 'একদিন তুমি আমার ভালবাসার মানুষের কণ্ঠ বহন করেছিলে।'

'কে তোমাকে মরুভূমি আর বাতাসের ভাষা শিখাল?'

'আমার হৃদয়।'

বাতাসের অনেক নাম আছে। পৃথিবীর এ অংশে নাম হল সিরোক্কো। কারণ সাগর থেকে শিতলতা নিয়ে আসে এটা। দূরের যে দেশ থেকে তারা এসেছে সেখানে এর নাম ল্যাভেন্টার, কারণ বলা হয় এ বাতাসই বয়ে আনে মরুর বালি। আর তার এলাকায় লোকে মনে করত বাতাস আসে আন্দালুসিয়া থেকে। কিন্তু আসলে বাতাস কোথাও থেকে আসে না। যায় না হারিয়ে। তাই এর শক্তি মরুভূমিরচেও বেশি। মানুষ মরুর বুকে গাছ বুনতে পারে, পারে ভেড়ার পাল চড়াতে। কিন্তু বাতাস আটকাতে পারবে না।

'তুমি নিশ্চই বাতাস নও, আমরা ভিন্ন জিনিস।' বাতাস বলে।

'সত্যি নয়। চলার পথে আমি এ্যালকেমিস্টের রহস্য জেনেছি। আমার ভিতরেই আছে বাতাসেরা, সব মরুভূমি, সাগরের দল, নক্ষত্রবীথি, সৃষ্টি জগতের প্রতিটা জিনিস। আমরা সবাই তৈরি হয়েছি এক হাতে। একই আত্মা আমাদের।

'আমি তোমার মত হতে চাই। যেতে চাই সাগর পাহাড় বন জঙ্গল আর মরুর উপর দিয়ে। বালি দিয়ে ঢেকে দিতে চাই আমার গুপ্তধন। বয়ে নিতে চাই ভালবাসার মানুষের কণ্ঠস্বর।'

'শুনলাম তুমি এ্যালকেমিস্টের সাথে আরেক দিনের কথা বলছিলে, সে বলেছিল যে সবার নিজের নিজের গন্তব্য আছে। তাই বলে তো মানুষ নিজেকে বাতাসে পরিণত করতে পারে না!'

'আমাকে সামান্য সময়ের জন্য বাতাস হয়ে যেতে শিখাও, যাতে আমি আর তুমি বাতাস আর মানুষের অসীম সম্ভাবনার কথা বলতে পারি।'

এবার উৎসাহী হয়ে ওঠে বাতাস। আগে কখনো এমন হয়নি। নানা কথা বলে সে। বলে অনেক কাজের কথা। বাতাসই তৈরি করেছিল মরুভূমি, ডুবিয়ে দিয়েছিল অসংখ্য জাহাজ, বয়ে গেছে বনের উপর দিয়ে, প্রবেশ করেছে বিচিত্র আওয়াজ আর সঙ্গীতে ভরা শহরের ভিতরে। এদিকে একটা ছেলে বলছে যে বাতাসের করার মত আরো অনেক ব্যাপার আছে।

'এটাকে আমরা বলি ভালবাসা। তুমি এ ব্যাপারটা শিখলে সৃষ্টির যে কোন কিছু শিখে যাবে। ভালবাসলে আর কোন কিছু বোঝার দরকার পড়ে না, কারণ যা হয় সব হয় তোমার ভিতরে। মানুষ বাতাসে পরিণত হতে পারে, যদি বাতাস সহায়তা করে।'

বাতাস অহঙ্কারি। ছেলেটার এত কথা তার কাছে ভাল ঠেকে না। রেগে যায়। উড়িয়ে নেয় মরুর বালি। তারপর হঠাৎ বুঝতে পারে, সে চাইলেই মানুষকে বাতাসে পরিণত করতে পারবে না। জানে না ভালবাসা ব্যাপারটা কী।

'পৃথিবীর পথে চলার সময় দেখেছি লোকে ভালবাসার কথা বলে আকাশের দিকে তাকায়। তারচে চল, স্বর্গকে প্রশ্ন করা যাক।'

'তাহলে সে কাজে হাত লাগাও। এখানে এত তীব্র মরুঝড় সৃষ্টি কর যেন সূর্যটা ঢাকা পড়ে। তখন আমি স্বর্গের দিকে তাকাতে পারব চোখের কোন ক্ষতি না করে।'

তীব্র বেগে বাতাস বইতে থাকে। আকাশ ঢেকে যায় বালিকণায়। সূর্যটাকে সামান্য এক সোনালি থালার মত দেখায়।

এদিকে ঘাটির ভিতরে কিছু দেখা যাচ্ছে না। মরুর মানুষ এমন বাতাস দেখে অভ্যস্ত। ডাকে সাইমুম নামে। এটা সাগরের ঝড়ের তুলনায় অনেক ভয়ানক। চিৎকার করে ওঠে ঘোড়াগুলো, বালু ঢুকে যায় সব অস্ত্রে।

এদিকে একজন সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমাদের মনে হয় এখানেই ব্যাপারটার ইতি ঘটানো উচিত।'

চোখে নীল পর্দা আর মনে ভয় নিয়ে তারা ছেলেটাকে দেখার চেষ্টা করে।

'বন্ধ করা যাক।' বলে ওঠে আরেক অধিনায়ক।

'আমি আল্লাহর মহত্ত দেখতে চাই,' অবশেষে মুখ খুলল সেনাপতি, 'দেখতে চাই কী করে একজন মানুষ নিজেকে বাতাসে পরিণত করে।'

কিন্তু মনে মনে সে একটা হিসাব করে নিয়েছে। যে দুজন প্রতিবাদ করেছিল তারা সত্যিকার সাহসী নয়। মরুর দেশের সাহসী মানুষ হলে তারা মৃত্যুকে ভয় পেত না। সরিয়ে দেয়া হবে তাদের, ঝড় থামার পর পরই।

'বাতাস বলেছে যে তুমি ভালবাসার কথা জান,' এবার সূর্যকে উদ্দেশ্য করে ছেলেটা, 'ভালবাসার কথা জানলে তুমি নিশ্চই ভুবনের আত্মার কথাও জান, কারণ তা ভালবাসায় গড়া।'

'আমি যেখানে আছি,' জবাব দেয় সূর্য, 'সেখান থেকে ভুবনের আত্মা দেখা যায়। এটা আমার আত্মার সাথে মিলে গেলে আমরা গড়ে তুলি গাছ, ভেড়াদের জন্য নিয়ে আসি ছায়া। এত উপরে থেকে থেকে আমি পৃথিবী থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। জানি, ভালবাসা কী।

'জানি, একটু সামনে এলেই পৃথিবীর বুকের সবকিছু ছারখার হয়ে যাবে। তখন পৃথিবীর কোন আত্মা থাকবে না। তাই আমরা একে অন্যকে সাহায্য করি, একে অন্যকে ভালবাসি এবং এভাবেই বয়ে আনি জীবনের বন্যা। দিই তাপ আর আলো, আর সে আমাকে দেয় বাঁচার কারণ।'

'তাহলে, তুমি জান ভালবাসা কী।'

'এবং আমি জানি পৃথিবীর আত্মাকে। সৃষ্টিজগতের পথে পথে চলার সময় আমরা অনেক কথা বলেছি। বলেছিল যে তার সবচে বড় সমস্যা হল শুধু খনিজ আর সজিরা জানে সবাই এক। যেমন, লোহাকে কখনো তামার মত হতে হবে না, তামাও হবে না স্বর্ণের মত। প্রত্যেকে যার যার কাজ করে যায়। নির্দিষ্ট জনের জন্য নির্দিষ্ট কাজ। এসবই দারুণ এক লয়ে থাকত যদি সে হাত সৃষ্টির পঞ্চম দিনে থেমে যেতেন।

'কিন্তু ষষ্ঠ দিন এল,' বলে যায় সূর্য।

'তুমি জ্ঞানী, কারণ দূর থেকে সব পর্যবেক্ষণ কর। কিন্তু ভালবাসা কী তা তুমি জান না। ষষ্ঠ দিন না থাকলে মানুষ সৃষ্টি হত না; তামা পড়ে থাকত তামার মত, সীসা সীসার মত। কথা সত্যি, সবারই একটা গন্তব্য আছে, আর একদিন সে গন্তব্য চেনা যাবে। তাই প্রত্যেককেই আরো ভাল কিছুতে পরিণত হতে হয়। যেতে হয় ভাল কোন পথে, যেন শেষ পর্যন্ত বিশ্বের আত্মাই একমাত্র হতে পারে।'

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবে সূর্য। তারপর আরো জ্বলজ্বলে হয়ে জ্বলে ওঠার সিদ্ধান্ত নেয়। এতক্ষণ কথা শুনছিল বাতাস। এবার আরো তীব্রবেগে বইতে শুরু করে যেন ছেলেটার কোন ক্ষতি না হয়।

'এজন্যই এ্যালকেমির অস্তিত্ব,' বলে চলে ছেলেটা, 'যেন সবাই যার যার গুপ্তধনের খোজ করতে পারে, আগের জীবনেরচে ভাল কিছুতে পরিণত হতে পারে। দস্তা সে পর্যন্ত কাজ করবে যে পর্যন্ত তাকে প্রয়োজন। তারপর পরিণত হবে স্বর্ণে।

'এ কাজ করে এ্যালকেমিস্টরা। তারা প্রমাণ করে যে যখন আমরা বর্তমানেরচে ভাল হতে চাই, আমাদের চারপাশের সবকিছুও তার সাথে ভাল হয়ে যায়।'

'তাহলে কেন বললে যে আমি ভালবাসার ব্যাপারটা জানি না?'

'কারণ ভালবাসা মরুর মত এক জায়গায় পড়ে থাকবে না, ঘুরে বেড়াবে না বাতাসের মত, দূর থেকে সব দেখবে না তোমার মত। ভালবাসা হল সে শক্তি যা পরিণত হয় বিশ্বের আত্মায়। সমৃদ্ধ করে পৃথিবীর আত্মাকে। প্রথমে আমার মনে হয়েছিল বিশ্বের আত্মা নিখুত। পরে দেখলাম আসলে এটা সৃষ্টির আর সব বিষয়ের মতই। অপূর্ণ। আছে নিজের ভাল এবং মন্দ। আমরাই

পৃথিবীর আত্মাকে সমৃদ্ধ করি, আর পৃথিবী ভাল হবে কি মন্দ হবে তা নির্ভর করে আমরা ভাল হব কি মন্দ হব তার উপর। এখানেই ভালবাসার শক্তি। ভালবাসার সময় আমরা আগেরচে ভাল হতে চেষ্টা করি।'

'তো? আমার কাছে কী চাও?'

'আমি তোমার সহায়তা চাই, যেন আমাকে বাতাসে পরিণত করতে পারি।'

'প্রকৃতি আমাকে সৃষ্টির সবচে জ্ঞানী হিসাবে জানে, আর আমি জানি না কী করে তোমাকে বাতাসে পরিণত করা যায়।'

'তাহলে, কাকে জিজ্ঞেস করব?'

একটু ভাবে সূর্য। খেয়াল করে শুনছে বাতাস। কিছুতেই বুঝতে দেয়া যাবে না যে সূর্যের জ্ঞানে কমতি আছে। সারা পৃথিবীতে কানাকানি পড়ে যাবে তাহলে।

'সে হাতের সাথে কথা বল যে এসব লিখেছে,' অবশেষে বলল সূর্য।

আনন্দে চিৎকার করে ওঠে বাতাস। বইতে থাকে সবচে জোরে। উড়ে গেছে তাবু, ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে সব প্রাণি। পাথরের সামনে সবাই হাতে হাত রেখে পড়ে থাকে যেন উড়ে যেতে না হয়।

এবার ছেলেটা ফিরে তাকায় সে হাতের দিকে যে সব লিখেছে। সাথে সাথে টের পায়, নিশ্চুপ হয়ে গেছে পুরো বিশ্বব্রহ্মান্ড। সিদ্ধান্ত নেয় সে, কথা বলবে না।

ভালবাসার এক তীব্র প্রবাহ আচ্ছন্ন করে ফেলে তাকে। শুরু করে প্রার্থনা। এমন প্রার্থনা এর আগে কখনো করেনি সে। কারণ এখানে কোন শব্দ নেই, নেই ঝঙ্কার।

এ প্রার্থনায় ভেড়াগুলোর নতুন মালিক জুটে যাওয়ার কারণে ধন্যবাদ নেই, নেই আরো স্ফটিক বিক্রি করিয়ে দেয়ার আবেদন, নেই সে মেয়ের কাছে ফিরে যাবার আকুতি। একেবারে চুপ করে থাকে ছেলেটা। চুপ করে থেকে টের পায়, আসলে বাতাস, মরুভূমি আর সূর্যও জীবনের সেই লেখা বোঝার চেষ্টা করছে।

সে দেখেছে, পৃথিবীর সর্বত্র লক্ষণ ছড়ানো। আর সে হাত এসব তৈরি করেছে কোন না কোন উদ্দেশ্যে। শুধু সেই হাতই পারে অলৌকিক ঘটাতে, পারে সাগরকে মরুভূমি আর মরুভূমিকে সাগর বানাতে... অথবা মানুষকে বাতাস।

কারণ শুধু সে হাতই জানে কোন মহাসূত্র দিয়ে এ ছ দিনে তৈরি করা হয়েছিল মহাকর্ম।

পৃথিবীর আত্মার ভিতর দিয়ে সে দেখতে পায়, এটা আসলে ঈশ্বরের আত্মার এক অংশ। দেখতে পায়, তার নিজের আত্মাটাও তার আত্মার একটা অংশ। আর তাই সে, সামান্য এক ছেলে, করতে পারবে অলৌকিক সব কান্ড।

সেদিনের মত করে আর কখনো সাইমুম বয়নি। তারপর, যুগ যুগ ধরে আরবরা বলে বেড়ায় যে তারা এক ছেলেকে বাতাস হয়ে যেতে দেখেছে। দেখেছে মরুর সবচে ভয়ানক সেনাপতিকে তার সব সহ বিদ্ধস্ত হয়ে যেতে।

মরুঝড় থেমে গেলে সবাই ছেলেটার দিকে তাকায়। সে তখন সেখানে নেই। দাড়িয়ে আছে এক বালুঢাকা প্রহরীর পাশে, ঘাটির অন্য প্রান্তে।

এ বিস্ময় দেখে থ বনে যায় সবাই। শুধু হাসছিল দুজন। সেই এ্যালকেমিস্ট, যে তার উত্তরাধীকারী দেখা পেয়েছে আর সে সেনাপতি যে ঈশ্বরের মহত্তের দেখা পেয়েছে।

পরদিন। ছেলে আর এ্যালকেমিস্টকে বিদায় জানায় সেনাপতি। তারা প্রহরী হিসাবে যতদূর খুশি নিয়ে যেতে পারে একদল সৈনিককে।

সারাদিন চড়ে বেড়ায় তারা। বিকালের শেষভাগে চলে আসে এক ধর্মশালায়। ঘোড়া থেকে নেমে এ্যালকেমিস্ট সৈন্যদের পাঠিয়ে দেয়।

'এখান থেকে তুমি একা যাবে,' বলল এ্যালকেমিস্ট, 'পিরামিড আর মাত্র তিন ঘন্টার পথ।'

'ধন্যবাদ, তুমিই আমাকে বিশ্বের ভাষা শিখিয়েছ।'

'আমি শুধু তোমার জানা ব্যাপারটা জাগিয়ে তুলেছি, ব্যস।'

ধর্মশালার দরজায় কড়ানাড়ে এ্যালকেমিস্ট, তারপর কালো কাপড় পরা সন্যাসীর সাথে কথা বলে কপটিক ভাষায়। ছেলেটাকে ঢুকিয়ে দেয় ভিতরে।

'আমি তার কাছে রান্নাঘর ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছিলাম।' হাসে এ্যালকেমিস্ট।

ধর্মশালার পিছনের রান্নাঘরে গিয়ে আগুন জ্বালায় সে, সন্যাসী একটু সিসা নিয়ে আসে, লোহার পাতে বসায় সে সেটুকু। সিসা গরম হয়ে এলে ঝোলা থেকে বের করে রহস্যময় হলুদ ডিমটা। তারপর সেখান থেকে চুলের মত সরু একটু অংশ তুলে নেয়। মোমে মুড়িয়ে নিয়ে দিয়ে দেয় গলিত সিসার সাথে।

মিশ্রণটার রঙ লালচে হয়ে গেছে। অনেকটা রক্তের মত। সরিয়ে আনে সে সেটাকে। তারপর ঠান্ডা হতে দেয়। এসব কাজ করতে করতে সন্যাসীর সাথে গোত্রযুদ্ধ নিয়েও কথোপকথন করে।

বিরক্ত হয়ে গেছে সন্যাসী। গিজার সামনে ক্যারাভান থেমেছিল একটু সময়ের জন্য, যুদ্ধ থামার জন্য।

'কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছাই সফল হবে।' বলে সন্যাসী।

'সত্যি।'

পাত্রটা ঠান্ডা হবার পর অবাক চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকে সন্যাসী-ছেলেটা দুজনেই। সীসা জমে গেছে। কিন্তু আর সীসা নেই। হয়ে গেছে স্বর্ণ।

'আমি কি কোনদিন কাজটা শিখতে পারব?' প্রশ্ন তোলে ছেলেটা।

'এটা আমার জীবনের লক্ষ্য, তোমার নয়। শুধু তোমাকে দেখানোর ইচ্ছা ছিল যে কাজটা করা সম্ভব।'

ধর্মশালার দরজার দিকে চলে আসে তারা। সেখানে এ্যালকেমিস্ট চারটা ভাগে ভাগ করে চাকতিটাকে।

'এটা আপনার জন্য,' বাড়িয়ে দেয় সন্যাসীর দিকে। 'ধর্মশালায় তীর্থযাত্রিদের সাথে যে ভাল ব্যবহার করেন, সেজন্য।'

'কিন্তু আমার ভাল ব্যবহারের বিনিময়ে ভাল সম্মানীও পাওয়া যায়।' জবাব দেয় সন্যাসী।

'আর বলবেন না কথাটা। জীবন হয়ত শুনে ফেলছে। পরেরবার আর এত নাও পেতে পারেন।'

এবার ফিরে তাকায় ছেলেটার দিকে, 'এটা তোমাকে দিচ্ছি। সেনাপতির কাছে যে জিনিসটুকু হারিয়েছ তার বিনিময়ে।'

সে বলতে নিয়েছিল যে আসলে এত স্বর্ণ দেয়নি সে। বলতে গিয়েও চুপ করে যায়।

'আর এটা আমার জন্য,' বলে একটা টুকরা ঢুকিয়ে ফেলে পকেটে, 'যুদ্ধের সময় আমাকে মরুভূমির ভিতর দিয়ে মরুদ্যানে পৌছতে হবে।'

চতুর্থ টুকরাটা বাড়িয়ে দেয় সন্যাসীর দিকে।

'আর এটা ছেলেটার জন্য। যদি কখনো দরকার পড়ে।'

'কিন্তু আমিতো গুপ্তধনের সন্ধানে বের হব।' প্রতিবাদ করল ছেলেটা, 'খুব কাছাকাছি চলে এসেছি।'

'আর আমি ভাল করেই জানি তুমি তা পাবে।'

'কেন?'

'কারণ এর মধ্যেই তুমি দুবার সব টাকাকড়ি খুইয়ে বসেছ। আমি বয়েসি সংস্কারাচ্ছন্ন আরব, বিশ্বাস করি আমাদের প্রবাদে। "একবার যা হয় তা আর কখনো হতে পারে না। কিন্তু যা দুবার হয় তা তৃতীয়বার হবেই।"

ঘোড়ার কাছে চলে যায় তারা।

'আমি তোমাকে একটা স্বপ্নের গল্প বলতে পারি।' বলল এ্যালকেমিস্ট।

ছেলেটা ঘোড়া আরো কাছে নিয়ে আসে।

'আদ্যিকালের রোমে, সম্রাট টিবেরিয়াসের সময়ে এক ভাল লোকের দু ছেলে ছিল। একজন সেনাবাহিনীতে কাজ করে বলে তাকে সব সময় দূর দূরান্তে থাকতে হত। আরেকজন কবি। মাতিয়ে রাখত পুরো রোম, দারুণ দারুণ কবিতায়।

'এক রাতে বাবা স্বপ্ন দেখে। এক দেবদূত এসে জানায় যে তাদের ছেলের কথা জানবে এবং পৃথিবীর মানুষ তার কথা বলে বেড়াবে অহর্নিশি। বাবা গর্বে উঠে বসে। সে এমন এক স্বপ্ন দেখেছে যা যে কোন বাবার কাছে আরাধ্য।

'কিছুদিন পর বাবা ভেঙে যাওয়া রথের হাত থেকে একটা বাচ্চা ছেলেকে উদ্ধার করতে গিয়ে মারা যায়। স্বর্গে গিয়ে দেবদূতকে প্রশ্ন করে স্বপ্নের ব্যাখ্যার ব্যাপারে।

' "আপনি খুব ভালমানুষ,' বলে দেবদূত, 'জীবন চালিয়েছেন ভালভাবে। মারা গেছেন সম্মানের সাথে। এখন আপনার যে কোন একটা কথা রাখতে পারি।"

' "আপনারা স্বপ্নে দেখা দিলে আমার জীবনটা আরো সুন্দর হয়ে ওঠে। মনে হয়, আমার কষ্টের ফলেই আমার ছেলের কবিতা যুগ যুগ ধরে পড়া হবে। আমি আর কোন পুরস্কার চাই না। চাই ছেলের অক্ষরগুলো দেখতে।"

'দেবদূত লোকটার কাধ স্পর্শ করে, দুজনেই চলে যায় অনেক অনেক ভবিষ্যতে। সেখানে অতিকায় সব গড়ন আর আছে হাজার হাজার মানুষ। কথা বলছে বিচিত্র সব ভাষায়।

'আনন্দে ডুকরে কেদে ওঠে লোকটা।

' "জানতাম, আমার ছেলের কবিতা অমর হবে। বিশ্বাস ছিল মনে।" কান্নায় ভেঙে পড়ে প্রশ্ন করে দেবদূতকে, 'দয়া করে বলবেন কি আমার ছেলের কোন গানটা গাইছে তারা?"

'কাছে যায় ফেরেস্তা, তারপর কোমল গলায় কথা বলে নিয়ে যায় পাশের এক বেঞ্চিতে।

' "আপনার যে ছেলে কবি ছিলেন তার কবিতা ছিল রোমে খুব বিখ্যাত, সবাই ভালবাসত। উপভোগ করত মন খুলে। কিন্তু টাইবেরিয়াসের সাম্রাজ্যের

পতন হলে হারিয়ে যায় কবিতাগুলোও। এখন যার লেখা শুনছেন তিনি আপনার যোদ্ধা ছেলে।"

'অবাক হয়ে দেবদূতের দিকে তাকায় লোকটা।

' "অনেক দূরে কাজ করতে গিয়েছিলেন সে ছেলে। পরে প্রাশাসক হন। হন ন্যায়বিচারক আর ভাল মানুষ। এক বিকালে তার এক চাকর অসুস্থ হয়ে পড়ে। মনে হয় মারা যাবে সে। আপনার ছেলে এক রাব্বির কথা শোনেন। লোকটা অসুস্থদের সুস্থ করে তুলতে পারেন, এমনি বলা হত। পথে জানতে পারেন, যে লোকের খোজে যাচ্ছে সে আসলে তিনি ঈশ্বরের পুত্র। আরো অনেক লোক তার কল্যানে সুস্থ হয়ে উঠেছে। তারা আপনার পুত্রকে সেই অবাক করা চিকিৎসকের দীক্ষায় দীক্ষিত করে। রোমান শাসক হয়েও তিনি গ্রহণ করেন নতুন ধর্ম। তারপর যান সেখানে, যেখানে তাকে পাওয়া যাবে।'

' "জানালেন তার ভৃত্যের অসুস্থতার কথা। রাব্বি সাথে সাথে তার বাসায় যাবার জন্য প্রস্তুত। এদিকে রাব্বির চোখে চোখ রেখে দক্ষ শাসক আপনার ছেলে বুঝে যান তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র।"

' "আর আপনার ছেলে এ কথাগুলো বলেছিলেন– *এ হল রাব্বির কাছে বলা তার কথা, আর কখনো সে কথা ভুলে যাওয়া হয়নি: হে প্রভু আমার, আমার ছাদের তলায় আসবেন, সে সৌভাগ্য নেই। নাহয় একটু কথা বলুন, তাতেই সুস্থ হয়ে উঠবে আমার ভৃত্য।*" '

এ্যালকেমিস্ট বলল, 'যাই করুক না কেন, পৃথিবীর প্রতিটা মানুষ এ গ্রহের ইতিহাসে একটা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। সাধারণত নিজেও তা জানে না।'

হাসল ছেলেটা। এক রাখাল ছেলের কাছে জীবনের প্রশ্নগুলো এত বড় হয়ে দেখা দিবে আগে কখনো ভাবেনি সে।

'বিদায়।' বলে এ্যালকেমিস্ট।

বিদায় জানায় ছেলেটাও।

মরুভূমির বুকে কয়েক ঘন্টা ঘুরে ঘুরে হৃদয়ের সব উপদেশ অনুসরণ করে মনে করে কথাগুলো যে আসলে তার হৃদয়ই বলে দিবে কোথায় আছে গুপ্তধন।

'যেখানেই তোমার গুপ্তধন থাক না কেন, সেইসাথে থাকবে তোমার হৃদয়ও।' বলেছিল এ্যালকেমিস্ট।

কিন্তু তার হৃদয় অন্য কোন কথা বলছে। হৃদয় বলছে এক রাখাল ছেলের কথা যে সব ছেড়েছুড়ে অন্য মহাদেশে চলে গিয়েছিল। বলে লক্ষ্যের কথা যা অনেকে দূর দূরান্তে ঘুরে, বহু শ্রম করেও পায় না। বলে ভ্রমণ, আবিষ্কার, বই আর পরিবর্তনের কথা।

আরো একটা টিবিতে ওঠার সময় কথা বলে উঠল হৃদয়, 'যে জায়গা চোখে অশ্রু আনে সে জায়গার ব্যাপারে সাবধান থেক। এখানেই আছি আমি, আর সেখানেই তোমার গুপ্তধন।'

ধীর গতিতে ছোটখাট পাহাড়ে ওঠে ছেলেটা। তাকায় সামনে। আকাশে গোল একটা চাঁদ ঝুলে আছে। এক মাস হয়ে গেল, রওনা দিয়েছে সে। সামনের অংশটুকু যেন সমুদ্র। সাগরের মত ঢেউ খেলানো বালিময় প্রান্তর। এ্যালকেমিস্টের সাথে দেখা হবার রাতের কথা মনে পড়ে যায় তার। চাঁদটা একেবারে নিশ্চুপ। নিশ্চুপ পুরো মরুভূমি।

আরেকটা টিবির উপরে উঠেই চনমন করে উঠল মনটা। সামনে ছড়িয়ে আছে মিশরিয় পিরামিড।

হাটু ভেঙে বসে পড়ে ছেলেটা। কান্না শুরু করে দেয়। এ লক্ষ্যের জন্য ধন্যবাদ জানায় ঈশ্বরকে, জানায় রাজার কাছে নিয়ে যাবার জন্য, বণিক-ইংরেজ-এ্যালকেমিস্টের কাছে নিয়ে যাবার জন্য। ধন্যবাদ জানায় এমন এক মেয়ের দেখা পাইয়ে দেয়ার জন্য যে বলেছিল, ভালবাসা কখনো কাউকে লক্ষ্য থেকে সরাতে পারে না।

এখন সে চাইলেই চলে যেতে পারে মরুদ্যানে। ফাতিমাকে বিয়ে করে আবার হয়ে যেতে পারে রাখাল। সেই এ্যালকেমিস্টও সীসাকে স্বর্ণ বানানোর ধারা জানত, তারপরও সে থেকে গেছে মরুদ্যানের বুকে। যা জানা প্রয়োজন সব জেনে নিয়েছে সে। চাওয়ার মত সব পেয়েছে।

কিন্তু এখনো একটা ব্যাপার বাকি। উদ্দেশ্যগুলো পূর্ণ না হলে কখনো কোন পরিকল্পনা আলোর মুখ দেখে না। চারপাশের বালিতে চোখ বুলায় ছেলেটা। দেখে, যেখানে চোখের পানি পড়েছিল, একজোড়া কাকড়া ঝগড়া করছে সেখানে। জানে, মিশরে কাকড়ার যুদ্ধ ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করে।

আরো এক লক্ষণ! ছেলেটা টিবি খুড়তে শুরু করে। মনে পড়ে সেই স্ফটিকওয়ালার কথা। কেউ চাইলে বাড়ির পিছনেই একটা পিরামিড বানাতে পারে। আসলে কখনোই সম্ভব নয়। সারা জীবন ধরে পাথরের উপর পাথর বসালেও সম্ভব নয়।

খুড়েই যাচ্ছে সে। খুড়ে যাচ্ছে। কিছু পাওয়া যায় না। মনে পড়ে যায়, অনেক শতাব্দি আগে তৈরি হত পিরামিড। আরো খুড়ে চলে। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত হয়েও থামে না সে। যেখানে অশ্রু পড়েছে সেখানে বালি সরিয়ে যায় অবিরাম।

কিন্তু নেমে যাবার আগে তাকে সম্পদ পেতে হবে। কয়েকজন মানুষের পায়ের আওয়াজ পায় সে। যারা এসেছে তাদের জামা তো দেখা যায়ই না, চোখেও কাপড় বাধা।

'কী করছ এখানে?' অবশেষে প্রশ্ন তোলে তাদের একজন।

কিছু বলে না ছেলেটা। সে পেয়ে গেছে গুপ্তধন। এখন শুধু অপেক্ষার পালা।

'আমরা হলাম গোত্রের উদ্বাস্তু। যুদ্ধ সব কেড়ে নিয়েছে। এখন, টাকা দরকার আমাদের। কী লুকাচ্ছ এখানে?'

'কিছুই লুকাচ্ছি না।'

কিন্তু একজন তাকে ধরে ফেলল। আরেকজন পকেট হাতড়ে বের করল সোনার সেই পাতটা।

'স্বর্ণ আছে এখানে!' বলে সে।

চাঁদের আলোয় দেখা যায়, তাকে ধরে রাখা লোকটার চোখেমুখে মৃত্যু খেলা করছে।

'সে মনে হয় আরো স্বর্ণ লুকিয়ে রেখেছে মাটির নিচে।'

তারা ছেলেটাকে খুড়ে যেতে বাধ্য করে, সে আর কিছু পায় না। বিকাল নামতে না নামতেই তারা সবাই মিলে মারা শুরু করে তাকে। ছিড়ে যায় কাপড় চোপড়। একটু পর তার মনে হয়, মারা যাবে।

'মারা গেলে টাকা কোন কাজে লাগবে? টাকা সব সময় প্রাণ বাচায় না।' বলেছিল এ্যালকেমিস্ট।

অবশেষে সে লোকগুলোকে শুনিয়ে বলে, 'আমি গুপ্তধনের আশায় বালি খুড়ছি!'

দুজনকে চেপে ধরার সময় এখান থেকে গুপ্তধন পাবার ইচ্ছা প্রবল হয়। এ পিরামিডের দেশে তার ভাবনারচেও বেশি গুপ্তধন আছে।

এবার দলপতি এগিয়ে আসে, 'ছেড়ে দাও। ওর কাছে আর কিছু নেই। কে জানে কোত্থেকে চুরি করে এনেছিল সোনার টুকরাটা!'

বালির উপর পড়ে যায় ছেলেটা। আর যাবার সময় দলনেতা চুল টেনে বলে, 'চলে যাচ্ছি আমরা।'

সবশেষে ফিরে আসে এখানে। তারপর বলা শুরু করে এক আজব কাহিনী, 'স্বপ্নে বিশ্বাস কর কেন এত! প্রায় দু বছর আগে এখানে শুয়ে শুয়ে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি। দেখেছিলাম যে আন্দালুসিয়ায় আছে একটা ভাঙা গির্জা। সেই গির্জার ভিতর থেকে উঠে গেছে বড়সড় একটা গাছ। গাছের তলায় পাওয়া যাবে গুপ্তধন। কিন্তু আমি এত বোকা না যে সামান্য এক স্বপ্নের জন্য পুরো মহাদেশ পাড়ি দিয়ে মরুভূমি, জঙ্গল, সাগর পাড়ি দিয়ে হন্যে হয়ে মরব। এসব আজেবাজে স্বপ্নের কোন মূল্য দিও না কখনো।'

তারপর চলে গেল তারা।

কাপতে কাপতে উঠে দাড়ায় ছেলেটা। আবার তাকায় পিরামিডের দিকে। যেন দাঁতমুখ খিচিয়ে পিরামিডগুলো হাসছে তার দিকে তাকিয়ে। সেও একটা হাসি ফিরিয়ে দেয়।

মন এখন পরিপূর্ণ।

কারণ সে জানে, কোথায় আছে গুপ্তধন।

সামনে দেখা

রাত নেমে আসার সময় ছেলেটা হাজির হয় ছোট খালি গির্জায়। এখনো বেদীর কাছে আছে গাছটা। আজো ভাঙা ছাদ দিয়ে আকাশ দেখা যায়।

ভেড়ার পাল নিয়ে আসার পর সে রাতের কথা মনে পড়ে যায় তার। কী শান্তিময় রাত ছিল... শুধু সমস্যা বাধায় স্বপ্ন।

এবার আর সে ভেড়ার পাল নিয়ে হাজির হয়নি, হাজির হয়েছে বেলচা নিয়ে।

বসে প্রথমে আকাশ দেখে নেয়। তারপর কাধ থেকে নামায় ঝোলা। বোতল খুলে একটু মদ্যপান করে নেয়। একদিন এভাবে আকাশের নিচে সে আর এ্যালকেমিস্ট মদ খেয়েছিল। মনে পড়ে ফেলে আসা অনেক পথের কথা। সবশেষে কৃতজ্ঞ বোধ করে। ঈশ্বর তাকে গুপ্তধন পাইয়ে দিতে চায়। সে যদি একাধিকবার দেখা স্বপ্নে বিশ্বাস না করত তাহলে দেখতে পেত না গণক মহিলাকে, রাজাকে, চোরটাকে... আরো অনেককে।

'যাক, তালিকা অনেক লম্বা। আর পথটা লেখা ছিল লক্ষণের সাথে। অনেক লম্বা তালিকা।' নিজেকে শোনায় সে।

ঘুমিয়ে পড়েছিল। জেগে উঠে দেখে মাথার উপর ঝলমলকছে আকাশ। বিশাল গাছটার কাছে গিয়ে গোড়া থেকে শুরু করে।

'হে বুড়ো জাদুকর,' আকাশের দিকে চোখ তোলে সে, 'তুমি চেয়েছিলে আমি এখানেই পাই। এমনকি একখন্ড স্বর্ণ রেখেছিলে আমার জন্য, যেন ফিরে আসতে পারি আন্দালুসিয়ার মাঠে ময়দানে। তুমি কি চাইলেই আমাকে তা পাইয়ে দিতে পারতে না?'

'না।' বাতাস ছাপিয়ে একটা কণ্ঠ কথা বলে ওঠে, 'আমি বলে বসলে তোমার আর পিরামিড দেখা হত না। দেখতে দারুণ, তাই না?'

মুচকি হেসে আবার কাজে নেমে পড়ে ছেলেটা। আরো আধঘন্টা পর প্রথম খটাং করে আওয়াজ ওঠে। পরে বেরিয়ে আসে স্প্যানিশ স্বর্ণমুদ্রা ভরতি একটা বাক্স। আরো আছে নানা জাতের দামি পাথর, সাদা আর লাল পালক

লাগানো সোনার মুখোশ, রত্নখচিত মূর্তি। এ দেশ ছেড়ে গেছে অভিযাত্রিরা, এখনো মাঝে মাঝে এখানে তাদের চিহ্ন পাওয়া যায়।

উরিম আর থুমিমকে বের করে সে। পাথর দুটা মাত্র একবার কাজে লেগেছিল। পরে আর দরকার পড়েনি। পথে পথে সব সময় ছিল অনেক লক্ষণ।

উরিম আর থুমিমকে বাক্সে ভরে নেয় সে। কারণ এটাও এক গুপ্তধন। এমন এক রাজার কথা মনে করিয়ে দেয় গুপ্তধনটা যার দেখা আর কখনো পাওয়া যাবে না।

কথা সত্যি, যারা স্বপ্নের পিছুধাওয়া করে জীবন তাদের কোন না কোনভাবে সহায়তা করবে, ভাবে ছেলেটা। এখন তারিফায় গিয়ে দশ ভাগের একভাগ দিয়ে আসতে হবে ভবিষ্যত বলা ঐ বুড়িকে।

এ বেদুইনরা আসলেই খুব বিচিত্র, তারা আশা করে অনেক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার, তার কারণ, মরুভূমিতে বাসা ছিল এককালে।

আফ্রিকার দিক থেকে বাতাস শো শো করে বইছে। এখন কি আবার তার মন ঘুরিয়ে দিতে চায় ল্যাভেন্ডার? এখন আর এ বাতাস মরুভূমির কথা মনে করিয়ে দেয় না। মনে করিয়ে দেয় না আক্রমণকারীদের কথা। বরং ভেসে আসে পথ চেয়ে থাকা এক নারীর গায়ের সুগন্ধি। সুগন্ধিটাকে সে চেনে। একটু একটু করে মেয়েটার গালে চুমু খেয়েছিল সে। তখন পাওয়া যায় এ নাম না জানা আতরের ঘ্রাণ।

আবার হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ছেলেটার চোখমুখ। এই প্রথম মেয়েটা এমন করল।

'আসছি আমি, ফাতিমা!' বলে ওঠে ছেলেটা।

কয়েক দশক পর পর এমন এক একটা বই বেরোয় যা পাঠকের জীবনটাকে বদলে দেয় চিরদিনের জন্য। পাওলো কোয়েলহোর দ্য এ্যালকেমিস্ট এমন এক বই। পৃথিবীব্যাপি ২৫ মিলিয়নেরও বেশি বিক্রি হয়েছে বইটা। অনূদিত হয়েছে অর্ধশতাধিক ভাষায়। সবচে বড় কথা, এর মধ্যেই দ্য এ্যালকেমিস্ট পেয়েছে আধুনিক ক্লাসিকের মর্যাদা।

জাদুময় কাহিনীটা সান্তিয়াগোর। আন্দালুসিয়ান রাখাল ছেলে সান্তিয়াগো, কোন এক গুপ্তধনের আশায় যে চষে ফেলতে চায় পৃথিবী এবং তার জন্য অপেক্ষার প্রহর গুণছে এ্যালকেমিস্ট। আছে ঘটনার ঘনঘটা, উত্তেজনা, সেই সাথে জীবনের অনেকগুলো না বলা সূত্র।

কোয়েলহোর জাদুবাস্তবতা আর প্রভাবের ব্যাপারে দ্য টাইমসে ছাপা হয়:

তার বইগুলো লক্ষ লক্ষ পাঠকের মনোজগত আর জীবন বদলে দেয়।

আর, বলা হয় দ্য এ্যালকেমিস্ট শুধু অনবদ্য রচনা নয় তার শ্রেষ্ঠ কাজ।

ISBN 984-32-3898-2

BDT : 100.00 Tk. Only